লিও টলস্টয়

জীবন ও সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে এই গ্রন্থখানি লিখিত হয়। পাণ্ডুলিপি সরাসরি বই আকারে প্রকাশের জন্যই তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু কাগজ-সংকটের দরুন বই প্রকাশে বিলম্ব হতে থাকায় বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। এইভাবে নন্দন, পশ্চিমবঙ্গ, হিতৈষী, চেতনিক, জাগৃতি, পর্যবেক্ষক, আর্য, স্বগত প্রভৃতি পত্রিকায় বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় ছাপা হয়। লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক-বর্গকে ধন্যবাদ।

বাংলা ভাষায় টলস্টয় চর্চার একটা ঐতিহ্য আছে। এ বিষয়ে এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত "টলস্টয় ও ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে আমি মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। একালেও এই আলোচনার প্রবাহে ভাঁটা পড়েনি। এই কালে টলস্টয় আলোচনায় যে সব লেখক সবিশেষ মনোযোগ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে পড়েন আমার অগ্রজদের মধ্যে ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতবিদ্য লেখকগণ এবং আমার সমকালীন ও পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে ৺ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, তীর্থরেণু দাস, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য প্রমুখ আমার বন্ধুস্থানীয় ও অনুজোপম লেখকবর্গ। এঁদের সকলেরই লেখা পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি এবং এই বই রচনায় এঁদের কাছে কোন না কোন ভাবে ঋণী। ঋণ স্বীকারে সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার অগ্রজতুল্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তক তাঁরই নামে উৎসর্গ করলাম।

যে সব সুহৃদ আমাকে বই সংগ্রহ করে দিয়ে ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে বন্ধুবর চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তা অতিশয় মূল্যবান। সাহিত্য-সতীর্থ সুহৃদ্‌জনদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারে সদা-অকুণ্ঠ এই নিঃস্বার্থ জ্ঞানব্রতী বন্ধুর শুভেচ্ছার কোন তুলনা হয় না। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে একাধিক উপলক্ষ্যে আমার টলস্টয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এমন টলস্টয় প্রেমী ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত বোধ করেছি।

এ ভিন্ন নন্দন পত্রিকার বিশেষ টলস্টয় সংখ্যা (মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫) কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য চয়নে এবং টলস্টয় সম্পর্কিত লেনিনের বক্তব্য উৎকলনে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তজ্জন্য পত্রিকা-সম্পাদককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। টলস্টয় চর্চার ক্ষেত্রে যে সব বিশিষ্ট বিদেশী লেখকের বই বা রচনা পড়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে আমি লাভবান হয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন—রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাকসিম গর্কি, চার্লস সারোথিয়া, এলমার মড ও লুইজি মড, ভিক্টর শ্লোভোস্কি ও আঁরি ত্রয়া। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

আমার বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীসুধীর ঘোষ মহাশয় বইয়ের পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে মুদ্রণের শেষতম পর্যায় পর্যন্ত বইটির প্রকাশে সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর আগ্রহ ব্যতীত এই বই যোটে লেখাই হতো না। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে তাঁর ভাই প্রকাশক শ্রীমান সুনীলের প্রতিও রইলো আমার অশেষ প্রীতি-স্নেহ-শুভেচ্ছা।

পরিশেষে প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এ বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাঁকে জানাই আমার প্রাণঢালা প্রীতি ও শুভকামনা। আমার কন্যাদ্বয় কল্যাণীয়া শ্রীমতী জয়শ্রী ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী শান্তশ্রী পাণ্ডুলিপি কপি করে দিয়ে আমার শ্রম লাঘবে সাহায্য করেছে। তাদের স্নেহাশীর্বাদ।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র
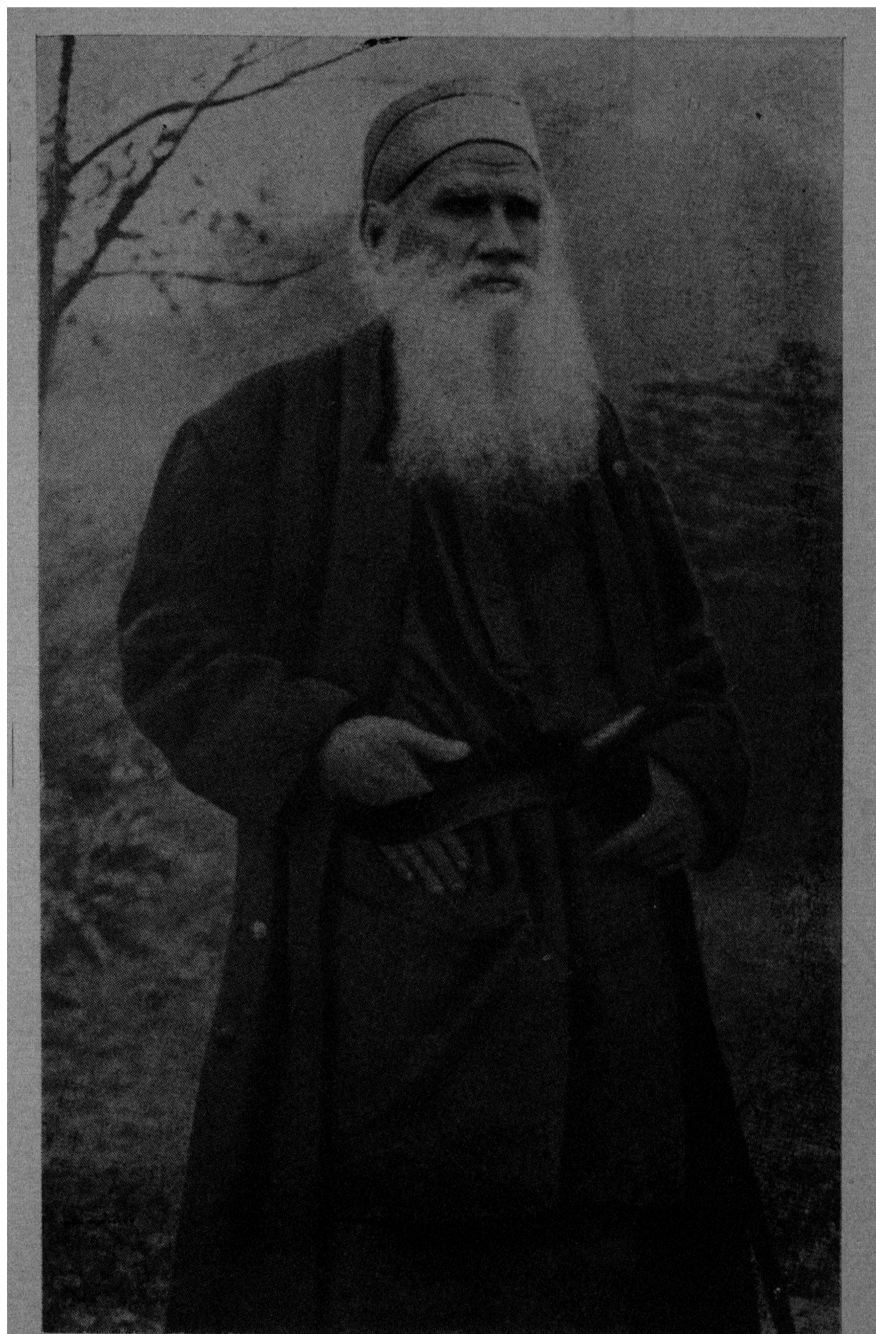
উপক্রমণিকা

'লেভ নিকোলায়েভিচ টলস্টয়' নামটিকে আমরা বাংলায় লিও টলস্টয় এই নামেই সচরাচর বলতে ও লিখতে অভ্যস্ত। তাঁকে তাঁর জীবৎকালে বলা হতো 'বিশ্বের জাগ্রত বিবেক' (দি লিভিং কনস্যান্স অব্ দি ওয়ার্লড)। অকারণে বলা হতো না। সত্যিই তিনি ছিলেন মানুষের কৃত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিবেকের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। মানুষ এখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্রের প্রতীক স্বরূপ বুঝতে হবে। টলস্টয় যেমন স্বীয় ব্যক্তি-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতন সম্পর্কে আপসহীন মনোভাব পোষণ করতেন, তেমনি আপসহীন ছিলেন সমাজের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়গুলির দ্বারা দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীগুলির শোষণের পর্বতপ্রমাণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আবার রাষ্ট্রীয় স্তরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার নিষ্পেষণ সম্পর্কে তিনি ছেড়ে কথা কইবার লোক ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি রাষ্ট্রমাত্রকেই কম বেশী পীড়নের যন্ত্র বলে মনে করতেন এবং তার উচ্ছেদ কামনা করতেন। তিনি ছিলেন রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলে 'অ্যানার্কিস্ট' অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদী।

'বিশ্বের জাগ্রত বিবেক' অভিধাটি বোধকরি টলস্টয় ব্যক্তিত্বের প্রতিই সবচেয়ে বেশী সুপ্রযুক্ত। কেননা তাঁকে চেতনার এই সমুন্নত স্তরে উপনীত হওয়ার আগে দীর্ঘদিন কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে এক দুশ্চর তপস্যা।

টলস্টয়ের জীবন ছিল ভুলে-ভরা ও জটিলতাময়। তাঁর গোটা যৌবনকাল লোভ-লালসা ও আরও কয়েক প্রকার অনুচিত আসক্তির (যথা জুয়ার নেশা, বিলাসিতা ইত্যাদির) কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত। মস্তবড় জমিদার পরিবারের সন্তান, সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, অবসর এবং ভোগসুখের সুযোগ জীবনে অপরিমিত। ফলে পথ ছিল স্বতঃই পিচ্ছিল, সংযম আচরণের ইচ্ছা থাকলেও তাকে কার্যকর করতে পারার পরিবেশের ছিল একান্ত অভাব। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রলোভন এসে তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, পাকে পাকে তাঁকে জড়িয়েছে মোহের বন্ধনে। লৌহ-দৃঢ় সংকল্পের কঠিনতার দ্বারা টলস্টয়কে এই অসহ অবস্থার পীড়ন থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতে হয়েছে এবং এক সময়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই উত্তরণকে এক কথায় বলা যেতে পারে আত্মজয়ের সাধনায় সিদ্ধি।

কীভাবে এই সিদ্ধি টলস্টয়ের করতলগত হয়েছিল তার ইতিহাস উপন্যাসের চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক। কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বলেও মনে হয়। সংক্ষেপে সে ইতিহাস এখানে বলছি।

টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে (নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী)। জন্ম রাশিয়ার এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে—কৌলিক সূত্রে প্রাপ্ত উপাধি 'কাউন্ট' টলস্টয়েরও অঙ্গভূষণ। মস্কো শহর থেকে ১০৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তুলার অদূরে ইয়াসনায়া পলিয়ানা নামক অঞ্চলে বিস্তৃত টলস্টয়দের জমিদারী—অরণ্যানী চাষের ক্ষেত্র উপবন সরোবর ইত্যাদি সমেত বিরাট এলাকা জুড়ে তাঁদের সুরম্য ভবন। এই ভবনে টলস্টয়ের বিরাশি বছর আয়ুষ্কালের কমপক্ষে ষাট বছর কাল অতিবাহিত হয়। এখানেই তাঁর 'কশাকস', 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', 'আনা কারেনিনা', 'টুয়েন্টি থ্রি টেলস্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া ছাড়া ভাবে প্রথমে গৃহশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে, পরে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল, সবশেষে সৈন্যবাহিনীতে থাকা কালে সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হয়। ছাত্রজীবন উল্লেখযোগ্য নয়; মামুলী একজন শিক্ষার্থীর চলনসই গোছের সাফল্য নিয়ে তাঁকে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অর্ধপথে সমাপ্ত করতে হয়েছিল। তবে এই অবসরে কয়েকটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সৈনিক জীবনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন—বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সেনাবিভাগের হাত থেকে সার্টিফিকেট লাভ করেছিলেন। তবে সৈনিক বৃত্তিতে বেশীদিন সংলগ্ন হয়ে থাকেননি—সর্বক্ষণের জন্য সাহিত্য চর্চার মানসে সৈনিক জীবনে ইস্তফা দিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেছিলেন। অতঃপর বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনে স্থিতি।

তারপর একটানা দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য জীবন, মৃত্যুতে (১৯১০) যার পরিসমাপ্তি। মাঝে কয়েক বৎসর সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য মস্কোয় এসে বসবাস করেছিলেন কিন্তু শহরবাস তাঁর ভাল লাগেনি। ইয়াসনায়া পলিয়ানার কৃষক প্রজাদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর মন সর্বদা আকুলি-বিকুলি করত। এক সময়ে মস্কো বাসের পাট চুকিয়ে দিয়ে পুনরায় আপন অভ্যস্ত সাধন-পীঠে ফিরে আসেন। আর তার সঙ্গে ছেদ ঘটেনি।

এই তো হলো টলস্টয়ের জীবনের মোটামুটি ছক। তবে এ ছক নিতান্তই বহিরঙ্গ; তার থেকে টলস্টয়ের অন্তরঙ্গ জীবনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। সে পরিচয় পেতে হলে এই অত্যাশ্চর্য প্রতিভাবান অসাধারণ চারিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষটির নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ আত্মসমীক্ষার কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত-

প্রায় মনোজীবনের সন্ধান নিতে হবে। টলস্টয়ের সেই অসামান্য জটিলতা ঘেরা অন্তর্জীবনের আলো-আঁধারের জগতে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব কী যন্ত্রণা নিজের মধ্যে অবিরত বহন করেছেন অন্ধকার থেকে আলোকের পৃথিবীতে উত্তরিত হবার জন্য, আপনার সত্তাকে কী ভাবে অনুক্ষণ কুটি-কুটি ফালা-ফালা করেছেন বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়নার ঘায়ে অহর্নিশ জর্জরিত করে। এই যাতনার জীবন এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তিময় ছিল না—যদি-বা কখনও আত্মবিস্মৃতির মধ্য দিয়ে ক্ষণিকের সোয়াস্তি লাভ করতে চেয়েছেন, একজন গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান ক্রীশ্চিয়ানের পাপবোধ এসে তাঁর সেই সাময়িক স্বস্তির আরামকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে—পাপবোধের সূত্রে এসেছে অনুতাপের দুর্নিবার দহন-জ্বালা। অনুতাপের আগুনে দগ্ধাতে দগ্ধাতে টলস্টয় পাবক-শুদ্ধ জীবনের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছেন, পরে যে জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে আমরা টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত দেখতে পাই তা এই ক্রমিক আত্মশোধন ও ক্ষমাহীন প্রায়শ্চিত্তেরই পরিণামফল মাত্র।

টলস্টয় ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি কিম্বা আচার আতিশয্য মানতেন না কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রকৃত যীশুভক্ত। প্রকৃত যীশুভক্তের মতই তিনি অনুতাপ বা অনুশোচনার তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। অনুতাপকে যদি আগুনের সঙ্গে তুলনা না করে অশ্রুজলের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সেই নিষেক টলস্টয়ের বেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল অশ্রুর প্লাবনে আর সেই অশ্রুর বন্যায় টলস্টয়ের সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল।

টলস্টয় হতে চেয়েছিলেন নিছক একজন সাহিত্য-শিল্পী লেখক, কিন্তু ওই পূর্বোক্ত অনুতাপবিদ্ধ বিবেকের প্রসাদে তিনি শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালেন কিনা একজন ঋষিপ্রতিম দার্শনিক ও ভাবুক, যাঁর ব্যক্তিত্বে 'জাতির জনক' কিংবা অবিসংবাদী দেশনায়ক কিংবা পিতামহকল্প অভিভাবকের ভূমিকা খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল বললেও চলে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের শেষভাগে তিনি সত্যিই আর লেখকমাত্র ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন বিভিন্ন দেশের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সংকটে বিপর্যস্ত পথসন্ধানীদের কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ—একজন 'প্রফেট' একজন 'মেসায়া', যাঁর নির্দেশ মান্য করে চললে জীবনে ভুল পথে চলার সম্ভাবনা কমে যায়। আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী ঠিক এইভাবেই টলস্টয়ের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন, প্রেরণা পেয়েছিলেন আরও একাধিক দিক্‌পাল মানুষ যাঁদের দীর্ঘ সারির মধ্যে গর্কি, শেখভ, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ সাহিত্য-শিল্পীরাই কেবল ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম জগতের মানুষ, রাজনীতির মানুষ, সমাজ

সেবার ক্ষেত্রের লোক। বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত র‍্যাডিকাল তরুণেরাও পরোক্ষ-ভাবে টলস্টয়ের কাছে ঋণী, কারণ টলস্টয়ের সাহিত্যের বাস্তবঘনিষ্ঠ সমাজ চিত্রণ থেকেই তাঁরা জারশাসিত রুশীয় সমাজব্যবস্থার জরাজীর্ণ ঘুণে-ধরা কাঠামোটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলে তার জায়গায় সমসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেনিনের উল্লেখ করা যায়। লেনিন টলস্টয়ের সাহিত্যকে বলেছেন "রুশ বিপ্লবের দর্পণ"। আরও নানা ভাবে তিনি টলস্টয়ের অমর প্রতিভার প্রশস্তি কীর্তন করে গেছেন।

মোটকথা টলস্টয় ছিলেন বহুকোণবিশিষ্ট অত্যুজ্জ্বল এক হীরকখণ্ডের মত বহুমুখী শক্তিধর মানুষ। রুচি ও প্রবণতা ভেদে এক এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কাছে তিনি এক এক রূপে প্রতিভাত—কারও চোখে তিনি শিল্পী, কারও চোখে তিনি ধর্মভাবুক, কারও চোখে অহিংসা মন্ত্রের ঋষি, কারও চোখে নিপীড়িত ও শোষিত স্তরের মানুষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, কারও মতে গভীর যীশুপ্রেমিক, আবার কারও মতে ধর্মবিদ্রোহী বিপ্লবী। প্রতিটি বিশেষণেই তাঁকে মানায়, কেননা এই সব কটি পরিচয়ই তাঁতে প্রযোজ্য। তাঁর ধর্মপ্রবণতা ও ধর্মদ্বেষিতা সম্পর্কে এই বললেই যথেষ্ট যে, যে-টলস্টয় বাইবেলের প্যারাবলগুলির ধরনে সহজ নীতিগল্পের আকারে যীশুর অমৃতোপম উপদেশগুলিকে 'টুয়েন্টি থি্ টেলস'-এর অনবদ্য শিল্প-রূপ দিয়েছিলেন ("বোকা আইভান", "মানুষের বাঁচার জন্য ক'হাত জমি দরকার?" ইত্যাদি), সেই টলস্টয়ই তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'রিসারেকসান' বা 'পুনর্জন্ম' লেখবার অপরাধে রুশ ধর্মযাজক সঙ্ঘ কর্তৃক গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন (১৯০১)। যে-যীশুভক্ত টলস্টয় ছিলেন ক্রীশ্চিয়ান 'নন-রেজিস্ট্যান্স টু ইভিল' বা অপ্রতিরোধ তত্ত্বের প্রবক্তা, সেই টলস্টয়ই আবার 'দুখোবর' নামক এক ক্ষুদ্র বিপ্লবী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমাজের কৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এমনকি জারেরও বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নিতে পশ্চাৎপদ হননি। রাশিয়ার তদানীন্তন অবস্থায় একজন অভিজাতের পক্ষে খোদ সম্রাটের বিরুদ্ধে যাওয়াটা এমন এক ঘটনা যা প্রতিরোধ তো ছার, রীতিমত বিদ্রোহের কোঠায় গিয়ে পড়ে। তেমন বিদ্রোহের নায়কত্ব করেছিলেন টলস্টয় জীবনে ন্যায়কে জয়যুক্ত করবার জন্য। আবার অন্যদিকে, যে-টলস্টয় ছিলেন কৃষকদের এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং রুশ কৃষক (মুঝিক)-দের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের জন্য স্বয়ং মুঝিকের মত কায়িক শ্রম করতেন এবং মুঝিকের পোশাক পরতেন, তাঁকে কারখানার শ্রমিকরাও সমপরিমাণে আপনার বলে মনে করতেন এবং তাঁর আত্মীয়তা দাবী করতেন। উদাহরণতঃ মালৎসেভস্কি কারখানার শ্রমিকরা

টলস্টয়কে লেখেন—"রুশ জনসাধারণ সর্বদাই আপনাকে আপনজন ভাবে, মহান মানুষ, প্রিয়জন ও ভালবাসার পাত্র ভেবে গর্ব বোধ করে।"

শিল্পী ও ঋষির বিরল সমন্বয়ের আধার টলস্টয় নিজেই একটা জগৎ বিশেষ, নানা মুখে সে জগতের প্রসার। সৃজনীশক্তি ও জ্ঞান দুই-ই তাঁর মধ্যে যুগপৎ প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল বলা যায়। সৃজনীশক্তির প্রমাণ তাঁর পূর্বোল্লিখিত অমর উপন্যাসসমূহ, নাটকাবলী ('দি পাওয়ার অব ডার্কনেস', 'ফ্রুটস অব এণ্টার-টেনমেণ্ট', 'রিপারেশন', মদ্যপান বিরোধী নাটকদ্বয় 'দি ফার্ষ্ট ডিষ্টিলার' ও 'দি কজ অব ইট অল' এবং 'দি লাইট শাইনস ইন ডার্কনেস', বার্নার্ড শ'র মতে যেটি টলস্টয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক) এবং অবিস্মরণীয় ছোটগল্পগুলি (ডি. এইচ. লরেন্স টলস্টয়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকার রূপে আখ্যাত করেছিলেন)। পক্ষান্তরে তাঁর জ্ঞানের প্রমাণ রয়েছে এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে—'হোয়াট ইজ আর্ট', 'দি কিংডম অব গড ইজ উইথিন ইয়ু', 'হোয়াট টু ডু', 'দি গসপেল ইন ব্রীফ' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'হোয়াট ইজ আর্ট' বইটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

টলস্টয়েয় সত্তায় শিল্পের সঙ্গে জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল তাঁর সহজাত আত্ম-সমীক্ষণের অভ্যাসের জন্য, যার কথা পূর্বেই বলেছি। এই অভ্যাস তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকতে দেয়নি, তাঁকে সতত নিজেকেই নিজের পরীক্ষাধীন করে রেখেছে। যৌবনোচিত চাপল্যে তিনি যখন ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দিতেন কিংবা লালসার ক্লেদ গায়ে মাখতেন, তখনও তাঁর সত্তার আরেকটি অংশ তাঁর কাজের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে চোখে চোখে রাখত এবং মনে মনে তাঁর সমালোচনা করত। এ যেন উপনিষদোক্ত দুই পাখি, একই মনের খাঁচার মধ্যে থেকে এক পাখি আরেক পাখির উপর নজর রাখছে। ডায়েরী রাখার অভ্যাস ছিল, সেই ডায়েরীরই সম্প্রসারিত রূপ হলো তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'চাইল্ডহুড' নামক আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত রচনা যার ভিতর তিনি তাঁর প্রথম বয়সের তাবৎ ভুলভ্রান্তি স্খলন-পতনের কথা অকপটে মেলে ধরেছিলেন। বইখানি রুশ পাঠক সমাজের মন কেড়ে নিয়েছিল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

টলস্টয়ের এই দুর্মর আত্মসমীক্ষণ সঞ্জাত বিবেকচর্চাই পরবর্তী জীবনে তাঁর স্বভাবের ও ব্যক্তিত্বের গোত্রান্তরণের কারণ। মধ্য বয়সে এমন একটা সময় এসেছিল—তখন তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসদ্বয় লেখা শেষ হয়ে গেছে—যখন তাঁর মনে হতে লাগলো এতকাল যা তিনি লিখে এসেছেন তা অলস বিত্তসচ্ছল বিলাসী ও ভোগী সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য। এখন থেকে সত্যিকারের আর্ট সৃষ্টিই তাঁর ব্রত হোক। সত্যিকারের আর্ট

হবে জনসাধারণের কল্যাণে উৎসর্গিত, সহজ সরল অনাড়ম্বর তার প্রকাশ, জটিলতার কুয়াশা ও অলংকারের ভার বর্জিত। যে আর্টের দ্বারা জনগণের মঙ্গল হয় না তেমন আর্ট সৃষ্টি নিরর্থক।

'হোয়াট ইজ আর্ট' বইয়ের এইটাই হলো মোদ্দা কথা—আর্টের এই জনগণ-মুখীনতার তত্ত্ব। এ তত্ত্ব শিল্পের সৌন্দর্যবাদী বা নন্দনবাদী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। পশ্চিম ইউরোপের কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্বকে (আর্টস ফর আর্টস সেক) টলস্টয় এই গ্রন্থে কঠোর সমালোচনা করেছেন। মতামতের ক্ষেত্রেই শুধু তিনি এই তত্ত্বের অসারতা প্রতিপাদন করে ক্ষান্ত থাকেননি, হাতে কলমে সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর নূতন বিশ্বাসের সার্থকতা দেখিয়েছেন। রিসারেকশন উপন্যাস ও টুয়েন্টি থি. টেলস সেই সার্থকতারই ফল। ছিলেন সৌন্দর্যবাদী, হয়ে উঠলেন নীতিবাদী। নীতিবাদী কথাটা এখানে তার সচরাচর প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ধর্তব্য নয়, তার শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধিত অর্থে গ্রহণীয়। টলস্টয়ের মত এতবড় মহান নীতিবাদী লেখক বিশ্বসাহিত্যে আর জন্মায়নি।

মতপ্রচারে আর লেখাতেই শুধু নীতিবাদের ঘোষণায় তৃপ্ত থাকেননি, আচরণেও ঘোষণার উপযুক্ততা অর্জনের চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ রয়্যালটির টাকা ও সম্পত্তির বহুলাংশ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিরক্ষর চাষী ও চাষীর ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপনা ও পরিচালনায় বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। এই নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে বিরোধ, যার ফলে জীবনের শেষভাগে গৃহে প্রচণ্ড অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই অশান্তিরই পরিণামে এক দুরন্ত শীতের রাতে টলস্টয়ের নিরুদ্দেশের পানে গৃহত্যাগ ও পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ (নভেম্বর ১৯১০)। সে কাহিনী যেমনি শোকাবহ তেমনি করুণ। উদার আদর্শবাদের সঙ্গে প্রবল সংসার আসক্তির সংঘর্ষ ঘটলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তার এক বিয়োগান্ত নিদর্শন সেই কাহিনী।

জীবন

টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে (নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী)। জন্মস্থান রুশদেশের অন্তর্গত ইয়াসনায়া পলিয়ানা নামক গ্রামে। জায়গাটি মস্কো শহরের ১০৩ মাইল দক্ষিণে সুবিস্তৃত বনভূমির মধ্যে অবস্থিত। সেখানে টলস্টয়দের পৈতৃক জমিদারী। পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে এই জমিদারীর সূচনা। এককালীন সামন্ততান্ত্রিক ভূমি প্রভুত্ব ইদানীং জমিদারীতে রূপান্তরিত। 'কাউণ্ট' এই পরিবারের কৌলিক উপাধি—এককালীন ভূম্যধিকার-তন্ত্র ও আভিজাত্যের স্মারক। অর্থাৎ জমিকেন্দ্রিক বনেদিয়ানার শীলমোহর আছে এই উপাধির মধ্যে।

ইয়াসনায়া পলিয়ানার জমিদারী এক প্রকাণ্ড ভূখণ্ড জুড়ে ছড়ানো। প্রায় তিনশো একর পরিমাণ জমি এর আয়তন। এতে কী নেই? আছে সুরম্য প্রাসাদভবন, বিশাল উদ্যান, ঝিল ও দীর্ঘিকা, দুপাশে বার্চ গাছের সারিতে সজ্জিত নির্জন বনপথ, অজস্র গাছপালা মণ্ডিত অরণ্যানী, সুপ্রসারিত কৃষিক্ষেত্র ও তৎসহ খামারবাড়ী, পরিকর-পরিচারকদের বসবাসের যোগ্য বহির্গৃহ, প্রজাদের কুটীর, ইত্যাদি। এই গৃহে টলস্টয়ের জন্ম এবং এই গৃহেই টলস্টয়ের বিরাশি বছর জীবনের কমপক্ষে ষাট বছর কাল অতিবাহিত হয়েছে। এইখানেই তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সমূহের অধিকাংশ রচিত আর এইটিই তাঁর চিন্তাচর্চার ও মত প্রচারের সাধনভূমি। চিন্তাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আচরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষারও এটি ছিল কর্মকেন্দ্র। 'টলস্টয়বাদ' বলতে আজকের দিনে যে বিশেষ জীবনদর্শন বোঝায় তার প্রভাব এখান থেকেই বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছিল।

মাকে হারান যখন টলস্টয়ের বয়স মাত্র বছর দুই। পিতাকে হারান সাত বছর বয়ঃক্রমকালে। শৈশবে মাতৃপিতৃহারা হয়ে টলস্টয় মানুষ হন প্রথমে ঠাকুরমার কাছে, পরে কাজানে পিসিমার কাছে। ১৮৪০ সাল থেকে কয়েক বছর ভাইবোন সহ টলস্টয়দের গোটা পরিবারটাই কাজানে পিসিমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এখান থেকে ফরাসী ও জার্মান গৃহশিক্ষক ও গৃহশিক্ষিকাদের অধীনে টলস্টয়ের পড়াশুনা চলতে থাকে। লেখাপড়ায় খুব মেধাবী ছিলেন এমন বলা যায় না, তবে একাধিক ভাষাশিক্ষার গোড়াকার পর্ব এখানেই সাধিত হয়। পরে বাড়ীর পড়া শেষ হলে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। কিন্তু ডিগ্রী না নিয়েই পড়ায় ক্ষান্তি দেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন।

লেখাপড়াতে তেমন মন না বসবার অন্যতম হেতু স্বভাবের চাঞ্চল্য ও প্রবৃত্তির দুর্দমনীয়তা। নাচগান, জুয়াখেলা, নেশাসক্তি ইত্যাদিতেই সময় ও মনোযোগ বেশী ব্যয়িত হতো। অভিজাত পরিবারগুলির সান্ধ্য মজলিস ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদের আসরের মধ্যমণি হয়ে জাঁকিয়ে থাকতেন। যদিও দেখতে তেমন সুপুরুষ ছিলেন না—ক্ষুদ্র চক্ষু, থাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট আর বেঁটেখাটো চেহারায় আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ জাগাবার সম্ভাবনাই ছিল বেশী কিন্তু অপরিসীম ছিল প্রাণশক্তি আর দুর্নিবার ভোগস্পৃহা। কৈশোরে ও প্রাক্-যৌবনে মাতাপিতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির শুভদায়ক প্রভাব বঞ্চিত হলে এবং তৎসহ ধনের প্রাচুর্যের ছিদ্রপথে আলস্য-বিলাসিতা ও অনিয়ন্ত্রিত সুখান্বেষণ কামনার অভিশাপ এসে জীবনে ঠাঁই গাড়লে উঠতি বয়সের যে কোন তরুণের সচরাচর যে পরিণতি হয়ে থাকে, টলস্টয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বিত্তের কৌলীন্য তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য আর সাংসারিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিল কিন্তু তাঁর অন্তরস্থ প্রকৃতিকে বাগ মানাতে পারেনি, বরং আর্থিক স্বচ্ছলতার সূত্রে তাঁর মন উত্তরোত্তর বহির্মুখী হয়ে উঠেছিল দেখা যায়।

বেশীরভাগ মানুষেরই জীবনে ভোগ অতৃপ্ত থাকে সুযোগের অভাবে—ভোগের উপকরণ অনায়াসলভ্য হলে কী হতো বলা যায় না। টলস্টয়ের ওই সমস্যা ছিল না, না চাইতেই কিংবা সামান্য চাওয়া মাত্রই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপচার তাঁর হাতের মুঠোয় এসে পড়ার বাধা ছিল না। এমন ক্ষেত্রে যা হয় তাই হয়েছিল —টলস্টয়ের জীবন বল্গাহীন, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল।

কিছু দিন বাড়ীতে এসে বসে থাকেন। কাজানে থাকা কালে নানা মতবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। মতবাদগুলির মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারগত দর্শন অন্যতম। বিশেষ করে রুশোর শিক্ষাদর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সঙ্গে চলতে থাকে নিরীশ্বরবাদের চর্চা। টলস্টয় তখন ঘোরতর নাস্তিক।

রুশোর শিক্ষাদর্শনের সূত্রগুলি হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখবার একটা ইচ্ছা জাগে। ইয়াসনায়া পলিয়ানায় ফিরে এসে তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ওই উদ্দেশ্যে নিজব্যয়ে স্কুল স্থাপনা করে অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ-পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কৃষক সন্তানদের তাঁর নবার্জিত শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী শিক্ষিত করে তুলতে গিয়ে তিনি জলের মত টাকা খরচ করতে লাগলেন।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। টলস্টয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দীর্ঘদিনের নিপীড়িত

ভূমিদাস চাষীদের সন্দেহ ঘুচতে চায় না। জমিদার প্রভুকে তারা বরাবর অত্যাচারী রূপে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, বদান্য রূপে কখনও দেখেনি। জমিদারের এই প্রজাবৎসল নয়া ভূমিকা তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। জমিদার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রজাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে উদ্যোগী হয়েছে এর মধ্যে কিছু 'কিন্তু' না থেকেই পারে না। নিশ্চয় জমিদারবাহাদুরের কিছু গূঢ় মতলব আছে। সেই মতলবের ফাঁদে পা দিতে চাষীরা রাজী নয়। সুতরাং স্কুল জমলো না। অনেক আয়োজন করে আর ঢাকঢোল পিটিয়ে যে পরিকল্পনার আরম্ভ, অনেক ব্যর্থতায় ঘটলো তার পরিসমাপ্তি।

এরকম হতেই হবে, এর আর চারা নেই। বরং এর উল্টোটা ঘটলেই আশ্চর্য হওয়ার ছিল। কোন ধনী ব্যক্তি, তা তিনি জমিদারই হোন আর যাই হোন—যখন উপর থেকে গরিবের মঙ্গল সাধন করতে প্রয়াসী হন, তখন সে মঙ্গল চেষ্টার ফল এরকম বিড়ম্বনায় পর্যবসিত না হয়েই যায় না। শ্রেণী-বৈষম্য-চেতনা বজায় রেখে এবং জীবনযাত্রার রীতিতে দুস্তর পার্থক্যের অবসান না ঘটিয়ে উপর থেকে নীচের মানুষের মঙ্গল করতে গেলে তার ফল বিপর্যয়কর হতে বাধ্য। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সন্দেহ-সংশয় এত সহজে দূর হয় না। অবিশ্বাসের জড় নিশ্চিহ্ন করতে হলে আরও মূলে গিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য চাই উপচিকীর্ষুর মানসিকতার আমূল রূপান্তর এবং যাদের উপকার করতে চাওয়া হচ্ছে তাদের প্রতি আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপে জীবন-যাত্রার ধরনে গভীর পরিবর্তন আনয়ন। চলায় বলায় বেশে বাসে আচার আচরণে নীচুতলার লোকদের সঙ্গে স্বীয় ব্যবধান ঘুচিয়ে তাদের সঙ্গে কমবেশী একাত্ম হতে পারলে তবেই তাদের কতক পরিমাণে উপকার করা সম্ভব। নয় তো নিষ্ফল প্রয়াস।

টলস্টয় একথার সারমর্ম তখন বোঝেননি। পরে বুঝেছিলেন। অনেক অভিজ্ঞতার মূল্যে ঠেকে শিখে উপলব্ধি করেছিলেন যে, গরীবের উপকার করতে হলে গরীবের স্তরে নেমে আসা চাই—পোশাকে আসাকে ধরনে ধারণে জীবনযাত্রার ঢঙয়ে। উপকারীর প্রতি উপকৃতের মনে প্রত্যয় জন্মানোর এছাড়া আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই। টলস্টয় যতদিন জমিদারীর চাল বজায় রেখে প্রজার মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলেন ততদিন তাঁর চেষ্টা বন্ধ্যা মাটিতে বীজ বোনার মত নিষ্ফল হয়েছিল। কিন্তু যখন থেকে স্বয়ং কৃষকের জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন করলেন, তাদের ধারায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন, তাদের মত বেশভূষায় অভ্যস্ত হলেন, এমনকি তাদের জীবিকা গ্রহণ করলেন—তখন টলস্টয়ের

প্রজাহিতের কার্যক্রম কী সুদূরপ্রসারী ফলই না প্রসব করেছিল। তিনি হয়ত তখনও যাকে বলে পুরোপুরি 'ডি-ক্লাশড' হওয়া—শ্রেণীচেতনাবিমুক্ত হওয়া তা হননি বা হতে পারেননি। কিন্তু যতটা হতে পেরেছিলেন তারই কি কোন তুলনা আছে? জঁাদরেল অভিজাত বংশাবতংশ স্বয়ং কাউন্ট মহোদয় আভিজাত্যের ধরাচূড়া ছেড়ে 'রুশ মুঝিক'-এর পোশাক পরছেন, নিজে হাতে জুতো সেলাইয়ের কাজ করছেন - এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কী হতে পারতো? অথচ উত্তরকালে টলস্টয়ের জীবনে এই আশ্চর্য ঘটনাই সংসাধিত হয়েছিল। সে এক অবিশ্বাস্য সংঘটন। কিন্তু আমি এখানে এর বেশী ভবিষ্যতের আগাম জানান দেব না। যথাস্থানে বিষয়টির বর্ণনা করব।

চাষী ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে ব্যর্থ হয়ে স্কুলের পাট গুটালেন। কিছুদিন ঘরে বসে রইলেন, ভাল লাগলো না। সেন্ট পিটার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) চলে গেলেন। উদ্দেশ্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ, লেখাপড়ার চর্চা, ইত্যাদি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নাগরিক জীবনের রীতিনীতির প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। জীবনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অবলম্বন না থাকলে যা হয়, যুবক টলস্টয় পুনরায় শিকার, জুয়া, মদ এবং আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি মারাত্মক ব্যসনের অনুশীলনে মেতে উঠলেন। জিপসী মেয়েদেয় সঙ্গে সারারাত হৈহল্লা করে কাটানো তাঁর প্রায় অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্যহীন জীবন এমনিতেই যথেষ্ট মন্দ, তার উপরে যদি তাকে আরও বেশী সাংঘাতিক করে তোলার জন্য বিত্তের প্রাচুর্য এসে হাতে হাত মেলায় তাহলে অবস্থাটা যে কত সঙীন হয়ে দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। টলস্টয়ের এই সময়ের জীবনযাপনের রীতি বাস্তবিকই অবর্ণনীয়। পর্বতপ্রমাণ সেই জীবনের ক্লেদ, দুর্বিষহ তার জালা।

অধঃপতনের চেতনায় দীর্ণবিদীর্ণ যন্ত্রণাময় ওই জ্বালাকর ক্ষতের দাহের উপশম ঘটাতে পারে এমন শান্তির প্রলেপ সেই সময় টলস্টয়ের চারপাশে কোথাও ছিল না—তিনি নিজে হাতেই সমস্ত শান্তির সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়ে চরম সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠেছিলেন। টলস্টয়ের এই সময়কার জীবনযাত্রা কোন্ ধারা বেয়ে এগিয়ে চলেছিল তার আন্দাজ দেবার পক্ষে এই বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর তদানীন্তন জীবনের ছক বারেবারেই আমাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত এককালীন বঙ্গীয় জমিদার নন্দনদের আমোদসন্ধানী জীবনের ছকটিকে মনে করিয়ে দেয়।

তাঁর কাল থেকে এতদিনের ব্যবধানে বাস করে এবং ভিন্নদেশে বসে এই সমস্ত ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে "যা রটে তার কিছু বটে" এই আপ্তবাক্য যদি ঠিক হয় তবে বলতেই হবে টলস্টয়ের ওই সময়ের জীবনরীতি মোটেই সমাজসম্মত, নীতিসংগত ছিল না—একান্ত অসুস্থ ও অস্বাভাবিক অবক্ষয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলতে চলতে তিনি অধঃপতনের পারঘাটার অতলে তলিয়ে যেতে বসেছিলেন।

কিন্তু টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের এই এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, তিনি পাপে লিপ্ত থাকার কালেও পাপের গর্হিতত্ব সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। অপরাধবোধের অঙ্কুশ তাড়নার দ্বারা তিনি নিরন্তর বিদ্ধ আর এই অঙ্কুশের খোঁচা তিনি নিজেই নিজের গায়ে প্রতিনিয়ত বিঁধিয়েছেন প্রতিকারহীন এক অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গিয়ে। অনুতাপের আগুনে নিত্য তাঁর চিত্ত দগ্ধিয়েছে। যত বেশী পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছেন তত বেশী পাপবোধ তাঁর অন্তর কুরে কুরে খেয়েছে। এই অস্থির, অশান্ত, যন্ত্রণাদিগ্ধ অন্তর্দাহ থেকে তাঁর মুহূর্তেকের মুক্তি ছিল না।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও বেদনাময় এই কঠিন আত্মসমীক্ষা বা আত্মসমালোচনার অভ্যাস। এ যাঁর স্বভাবে আছে তাঁকে আর ভাবতে হয় না, তাঁর ওই মজ্জাগত আত্মপরীক্ষার বৃত্তিই নানান সংশোধনের স্তর পরম্পরা অতিক্রম করে তাঁকে একদিন আরোগ্যের তীরে পৌঁছে দেয়। তাঁর দুর্নিবার অপরাধবোধই তাঁকে অপরাধ থেকে মুক্তি দেবার দিঙ্‌নির্দেশক হিসাবে কাজ করে। তাঁর অনুতাপই তাঁর রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে। অনুতাপের আগুন ভিতরটাকে দগ্ধে দগ্ধে যাঁর চোখে যত বেশী অশ্রু ঝরায় তত বেশী তাঁর উদ্ধারের সম্ভাবনা।

দুর্নিবার অপরাধবোধ, গভীর অনুশোচনা, অনুতাপের অশ্রুজলে পাপ ধুয়ে-মুছে যাওয়ার তত্ত্ব—এসব খৃষ্টীয় বিশ্বাসের কথা। ভক্ত ক্রীশ্চিয়ানেরা এই তত্ত্ব অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন ও সেইভাবে চলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় তত্ত্বের মোড়ক থেকে আলাদা করে নিলেও এই তত্ত্বের সারবত্তা অক্ষুন্ন থাকে। আত্মসমালোচনা ও অনুতাপের তত্ত্ব বোধ হয় একটা সাধারণ মানবীয় সত্য রূপেই সর্বত্র গ্রাহ্য হওয়ার অপেক্ষা রাখে। টলস্টয়ের জীবনে যেমন এর প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়েছিল তেমনি দেশী-বিদেশী একাধিক মহাপুরুষের জীবনের রূপান্তরেও এর কার্যকারিতা দেখতে পাই। সন্ত অগাস্টিন ও অন্যান্য একাধিক খৃষ্টীয় সাধু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের জীবনেতিহাস এই তত্ত্বের সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করে। উনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় ব্রাহ্ম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

অনুতাপের তত্ত্বে এতই গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি মনে করতেন অনুতাপের মধ্য দিয়েই একমাত্র মানুষের প্রকৃত ধর্মজীবনের উজ্জীবন সম্ভব।

ধর্মের অনুষঙ্গ বাদ দিয়েও বোধকরি এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করে নেওয়া চলে। সংশোধনের একেবারে পরপারে চলে গেছে এরকম আরোগ্যের অতীত দাগী অপরাধীর (কনফার্মড্ ক্রিমিনাল) দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিলে, সাধারণভাবে এ কথা নিশ্চয়ই মানতে হবে যে, আত্মসমীক্ষার অভ্যাস ও অনুতাপ বহু বিপথগামী মানুষের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে যুবকের সংখ্যাও বড় কম হবে না।

টলস্টয় যে পরবর্তী জীবনে এত মহান্ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন—কি সাহিত্যে কি চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়া স্পর্শ করেছিলেন—তার মূলে ছিল তাঁর এই মজ্জাগত আপনার কাজকে আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার অভ্যাস। অপরাধ আচরণের জন্ম অনিয়ন্ত্রিত সুখান্বেষণ স্পৃহা থেকে কিন্তু অপরাধবোধের জন্ম ভিন্ন সূত্র থেকে, এই সর্বক্ষণস্থায়ী আত্মসমীক্ষার অভ্যাস থেকে। টলস্টয়ের ছোটবেলা থেকেই ডায়েরী রাখবার স্বভাব ছিল। ওই ডায়েরীতে স্বীয় ভুল-ত্রুটী, স্খলন-পতন, অন্যায় ইত্যাদির অকপট স্বীকৃতি থাকত। সেই অকপট স্বীকৃতিরই আরেক নাম হলো আত্মসমালোচনা, যেখানে থেকে অনুশোচনা খুব দূরবর্তী নয়। এই সব ডায়েরীরই সম্প্রসারিত রূপ হলো পরবর্তী সময়ের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ—'চাইল্ডহুড', 'বয়হুড', 'ইয়ুথ' ও 'মাই কনফেশন'। প্রতি বইয়েতেই নিজের অন্তর্জীবন তথা গোপন জীবনকে খোলা পুঁথির মত তুলে ধরা হয়েছে। রুশোর আত্মজীবনী কিংবা গান্ধীর আত্মজীবনীর সঙ্গেই শুধু এই বইগুলির প্রকৃতি তুলনীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চাইল্ডহুড বইটি লেখা টলস্টয় যখন সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন সেই সময়ে। এই বই-ই প্রথম টলস্টয়কে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর নাম গোটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

টলস্টয় সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করেন তাঁর দাদার মধ্যস্থতায়। তাঁর দাদা তখন ককেসাসে সৈন্যবিভাগের অফিসার। টলস্টয় কেন সৈন্যদলে ঢুকেছিলেন? খুব সম্ভব ইয়াসনায়া পলিয়ানার ভোগবাসনার জীবনে ক্লান্ত হয়ে পরিবর্তনের আস্বাদ লাভের আশায় কিংবা তদানীন্তন রুশ অভিজাত পরিবারগুলির রীতি অনুসরণ করে সৈন্যদলের খাতায় নাম লেখানোকেই আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ কুলচিহ্ন বলে ভেবেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে অর্থের অস্বাচ্ছল্য ঘটেছিল, তাই রোজগারের মানসে নতুন আয়ের উপায় সন্ধান। জমিদারীর সম্পদ অঢেল হলেও

অফুরন্ত ছিল না। তার উপর জমিদার সন্তান বিলাসী আর অমিতাচারী হলে জমিদারী ফুঁকে দিতে কতক্ষণ। তাই টলস্টয় একটা সীমা পর্যন্ত পৌছে উচ্ছৃঙ্খলতার পর্বে দাঁড়ি টেনেছিলেন এবং অন্য দিকে—বর্তমান ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর কাজে—মনের গতি ফিরিয়ে ছিলেন। টলস্টয়ের সম্বিৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তাঁর মনোযোগের ক্ষেত্রবদল ঘটিয়েছিল এবং তাঁকে আত্মস্থ হবার একটা স্থযোগ দিয়েছিল।

টলস্টয় নিযুক্ত হয়েছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর কাজে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশের পরও টলস্টয়ের স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। এখানে এসেও তাঁর পুরনো নেশাগুলি তাঁকে ছাড়েনি। উপরন্ত, স্বীয় সহ-সৈনিকদের মধ্যে বন্য ও দুর্দান্ত আচরণের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জুয়ার টেবিলে, পানালয়ে উদ্দাম স্বভাব বাঁধ ভেঙে মাঝেমাঝেই প্রকাশ পেত, তবে এখানে আসার পর টলস্টয়ের স্বভাবে একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। এখান থেকেই তাঁর লেখার অভ্যাস শুরু হয়। চাইল্ডহুড এই অধ্যায়ে লেখা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কয়েকটি ছোট গল্প এই অধ্যায়ের দান।

সৈনিক জীবনের বিক্ষেপের মধ্যে কেন তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন? সে এই কারণে যে, ব্যারাক জীবনের রুটিনের একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষার তা ছিল এক উপায়। তাছাড়া সাধারণ সৈন্যদের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সহ-সৈন্যরাও তাঁর চারিত্রিক স্খলন-পতন মেনে নিয়েও তাঁর স্বভাবের উদারতার জন্য তাঁকে ভালবাসত। নিজের জমিদারীর প্রজাদের কাছ থেকে তিনি স্কুল চালাতে গিয়ে যে বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এখানকার অভিজ্ঞতা তার থেকে এতই পৃথক যে, সৈন্যদের সহৃদয় আচরণ তাঁর ব্যথার ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল এবং তাঁকে সাহিত্য রচনাকার্যে প্রবৃত্ত করিয়েছিল।

অন্যপক্ষে সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের তাঁর মনে হয়েছিল হৃদয়হীন, ক্রুর, স্বার্থপর। নিজেদের মধ্যে পদের বড়-ছোট আর সম্রাটের অনুগ্রহে ভাগ বসানোর প্রতিযোগিতায় প্রমোশন, বদলী ইত্যাদি নিয়ে সর্বক্ষণ পারস্পরিক ঈর্ষার জ্বলুনি-পুড়ুনিতে তারা ভুগতো। অফিসারদের সঙ্গে সাধারণ সৈনিকদের আচরণের পার্থক্য সাধারণ সৈনিকদের প্রতি টলস্টয়ের চিত্তকে একান্ত অনুকূল করে তুলেছিল। তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর সেবাস্তোপোল যুদ্ধের গল্পগুলির মধ্যে। এই গল্পগুলি তাঁকে প্রভূত স্বীকৃতি এনে দেয়। রুশ সমালোচকেরা তাঁকে একটি নতুন প্রতিভারূপে অভিহিত করে তাঁর অভ্যুদয়কে স্বাগত জানালেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করলেও এবং সে বীরত্বের জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা সম্মানের শিরোপা মিললেও সৈনিকের বৃত্তি টলস্টয়ের ভাল লাগেনি। যুদ্ধ ব্যাপারটাই তাঁর কাছে একটা চরম বুদ্ধিহীন কাজ বলে মনে হতো। এই নিরর্থক হত্যাকাণ্ডে মানুষ কেন মাতামাতি করে তার কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সৈনিকবৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগের জন্য তাঁর মন ছটফট করতে থাকে। দেশবাসীর কাছ থেকে লেখক হিসাবে সমাদর তাঁর মনকে সৈনিকবৃত্তির প্রতি আরও বেশী বিমুখ করে তোলে। এক সময়ে তিনি সত্যিই তাঁর সংকল্পকে কার্যকর করেন। ১৮৫৬ সালে সৈনিকজীবনের পর্বে সমাধা ঘটিয়ে টলস্টয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে আসার পর তিনি লেখক সমাজ কর্তৃক আন্তরিকভাবে অভ্যর্থিত হন। টুর্গেনিভ ছিলেন এই স্বাগত জ্ঞাপনকারী লেখকদের অগ্রণী। পরে দুজনার মধ্যে গভীর সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যদিও দেখা যায় বন্ধুত্বের একটা পর্বে দুজনার মধ্যে কোনও এক ব্যাপারে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়েছিল, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার এক সর্বনাশা ঘৃণ্য অভ্যাস ডুয়েল-লড়ার সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌছুনোর উপক্রম হয়েছিল। ভাগ্যিস ওই কালান্তক ডুয়েল খেলার লড়াই হয়নি, নয় তো কী পরিণাম হতে পারতো ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। (এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি অমরস্রষ্টা পুশকিনের জীবনাবসান হয়েছিল শোচনীয় এই ডুয়েল লড়তে গিয়েই। আত্ম-মর্যাদা রক্ষার নামে কী বর্বর প্রথা! ওটা বোধ হয় হিংসায় আপাদমস্তক জর্জরিত পশ্চিমী সভ্যতার কোটরাশ্রিত দেশগুলির ঐতিহ্যের পক্ষেই সম্ভব। ডুয়েল-যুদ্ধ, ষাঁড়ের লড়াই—কী সব চমৎকার ব্যাপার!)

যাক্ টলস্টয়-টুর্গেনিভ বাদ-বিবাদ প্রসঙ্গ। মূল কাহিনীর ধারায় ফিরে আসি। সৈন্যবাহিনীর কাজে ইস্তফা দিয়ে কিছুদিন সেন্টপীটার্সবার্গে এসে বাস করলেন। লেখকদের সাহচর্যে দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগলো না লেখকদের সান্নিধ্য। তাঁদের দলাদলি, চিত্তসংকীর্ণতার আবহে মন হাঁফিয়ে উঠলো। দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬১ সাল এই চার বছর টলস্টয় জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ালেন। জার্মানীতে পরিভ্রমণ কালে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা ধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। একদা রুশোর শিক্ষাদর্শ মনোহরণ করেছিল, এবারে রুশোর স্থান অধিকার করলেন ফ্রোয়েবেল। শিক্ষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা টলস্টয়ের বরাবরের একটা শখ ছিল। মনে মনে সংকল্প করলেন দেশে ফিরে গিয়ে ইয়াসনায়া

পলিয়ানার কৃষক সন্তানদের মধ্যে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ-পরীক্ষা করবেন।

অর্থাৎ পুরনো রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো। সমাজ সংস্কার যাঁর রক্তে তাঁকে কি আর দু-একটা ব্যর্থতার ধাক্কায় কাবু করা যায়? মানুষের ভাল করবেন বলে যিনি পণ করেছেন মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাঁর মানবতা স্পৃহার ধার কতটুকু ভোঁতা করতে পারে? প্রজাকল্যাণে কৃতসংকল্প টলস্টয় এবার আটঘাঁট বেঁধে তাঁর স্বীয় প্রভাবাধীন জমিদারীর এলাকায় ভূমিসংস্কারের কাজে হাত দেবেন বলে মনে মনে স্থিরনিশ্চয় হলেন।

প্যারিস প্রবাসকালে সে দেশের লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। খুব যে ভাল ধারণা নিয়ে ফিরলেন তা বলা যায় না। তাবড় সব কবি নাট্যকার কথাসাহিত্যিক ও সমালোচক, ছুঁদে সব চিত্রশিল্পী প্রভৃতি যে ধারায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত তার মধ্যে এতাবৎ অনুসৃত তাঁর নিজের জীবনের ছকটিকেই যেন প্রতিফলিত দেখতে পেলেন। উচ্ছৃঙ্খলতার চরম, উদ্দামতার একশেষ। পাশ্চাত্য শিল্পীদের পরিভাষায় যাকে বলে 'বোহেমিয়ান' জীবন যাত্রা, সেই উড়নচণ্ডী বেহিসাবী বাউণ্ডুলেপনার চূড়ান্ত প্রকাশ প্যারিসীয় জাতভাইদের মধ্যে দেখতে পেয়ে তাঁর মন বিদ্রোহ করে উঠলো। নিজে তিনি যে জীবন যাত্রার ছাঁচ কাটিয়ে উঠতে চান এবং অসাধারণ মনোবলের সাহায্যে সেই সংযমসাধনার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছেন, ফরাসী সতীর্থ সহকর্মীদের মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি দেখে তিনি যে তাঁদের প্রতি খুব বেশী শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠতে পারেননি, সে কথা বলাই বাহুল্য। কেমন করেই বা পারবেন? নিজের দুর্বলতা অন্যের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে পেলে দল আরও ভারী হওয়ার সম্ভাবনায় 'সাঙাত' শ্রেণীর লোকেরাই শুধু উল্লসিত হয়, বিবেকী মানুষেরা হন না। তাঁরা বরং বিমর্ষ বোধ করেন। মানবীয় প্রবৃত্তির নিম্নগামিতা এত বেশী সাধারণ দুর্বলতা কেন এই ভেবে বিমূঢ়তার অনুভবে কাতর হন।

টলস্টয় যে প্যারিসীয় শিল্পী জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় মোটেই খুশী হননি তার সাক্ষ্য মিলবে তাঁর পরবর্তীকালীন প্রসিদ্ধ বই 'হোয়াট ইজ আর্ট?'-এর পৃষ্ঠাগুলিতে। প্যারিসের জাঁদরেল সব কবি-শিল্পীদের (যথা, মোপাসাঁ, বোদলেয়ার, ভার্লেন, মালার্মে, রেনাঁ প্রমুখ) তিনি ওই বইতে তুলো-ধুনো করে ছেড়েছেন। পরে যথাস্থানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবার পরে তখন থেকে ইয়াসনায়া পলিয়ানাই হয়ে

উঠলো তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। রাশিয়ায় তখন সামন্ততন্ত্রের বন্ধনরজ্জুতে বাঁধা ভূমিদাসদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব চলছে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের এই সংক্রান্ত সংকল্পিত পদক্ষেপের ভিতর ভূমিদাসদের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সম্রাটের কার্যক্রমের ভালমন্দের আলোচনায় রাশিয়ার আকাশ বাতাস মুখর। কারও মতে প্রস্তাবটি সম্রাটের উদার মনোভাব প্রসূত, আবার কারও কারও চোখে বিলীয়মান রাজতন্ত্রকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করবার এ এক কৌশলী প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। বিলয়ের শেষ ধাপে উপনীত রুশ সামন্ততন্ত্র আর তার কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারের প্রতীক জারতন্ত্রকে ঠেকো দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার এ এক শেষ চেষ্টা।

সম্রাটের প্রস্তাবিত সংস্কার প্রয়াসের ব্যাখ্যা যাই হোক, টলস্টয় কিন্তু আপন জমিদারীতে সম্রাটের আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় বসে রইলেন না, নিজেই উদ্যোগী হয়ে ভূমিদাসদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে আরম্ভ করলেন। ভূমিদাসরা স্বাধীনতা পেলো। দীর্ঘদিনের অধীনতায় অভ্যস্ত ভূমিদাসরা তাদের সদ্যপ্রাপ্ত মুক্তিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, মুক্তির স্বাদ পেয়েও মুক্তিকে অলীক জ্ঞানে বিভ্রান্ত বোধ করছিল। প্রায় একই সময়ের অনুরূপ আর একটি ঘটনার আদল এই ঘটনায় স্পষ্ট। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত আমেরিকার নিগ্রোদের মুক্তির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় একই প্রকার অস্বস্তিকর অনুভব হয়েছিল।

অবশ্য সংস্কার প্রয়াসের সোচ্চার সমর্থক 'প্রগতিবাদীদের' লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর লক্ষ্যের মিল থাকলেও তাঁদের কার্যপদ্ধতির তিনি সমর্থক ছিলেন না। তাঁদের ঘোষণা ও কাজগুলিকে তিনি খানিকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে টলস্টয় তাঁর জমিদারীতে ভূমিদাসদের মুক্তিদানের ব্যাপারে যা কিছু করেছিলেন তা নিজের তাগিদেই করেছিলেন। 'প্রগতিবাদীদের' আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগ ছিল না।

টলস্টয় ভূমিদাসদের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবারও উদ্যোগ নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। সেই পুরাতন উদ্যমের নূতন প্রয়োগ, তবে এবার প্রয়োগ পরীক্ষার ভিত্তি রুশো নয়, ফ্রোয়েবেল। পূর্ণ অধ্যবসায় নিয়ে নতুন ধারায় স্কুল চালালেন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেমনটি করেছেন তেমনিভাবে তিনিও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে স্বয়ং শিক্ষকতার কাজে যথেষ্ট সময় দিতে লাগলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশলেন। নিজেই কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লিখলেন।

কিন্তু এত করেও স্কুল দুবছরের বেশী চললো না। একে একে শিক্ষকেরা

বিদায় নিতে লাগলেন, ছাত্রদের সংখ্যাও ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এলো। এক সময় স্কুল উঠে গেল।

এততেও না দমে তিনি আবার নতুন করে স্কুল খুলবেন মনস্থ করলেন কিন্তু এবার আর সরকারের অনুমতি পাওয়া গেল না। সরকার বোধহয় ততদিনে টলস্টয়ের অভিপ্রায়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর প্রজাসংযোগের কার্যক্রমের উপর কল্পিত উদ্দেশ্য আরোপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ যাই হোক, সাধের বিদ্যালয় খোলার আর ছাড়পত্র মেলেনি।

সরকার অবশ্য তাঁকে ভিন্নতর একটি কাজ দিয়ে অন্যভাবে ব্যাপৃত রাখবার চেষ্টা করলেন। নয়া ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা অনুযায়ী জমি বণ্টনের ব্যাপারে একাধিক ক্ষেত্রে বিরোধের উদ্ভব হতো। সেই সব বিরোধের মীমাংসায় শালিসীর দায়িত্ব পালনের জন্য টলস্টয়কে আহ্বান জানানো হলো। কঠিন পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু এ দায়িত্ব তিনি হাসিমুখেই স্বীকার করে নিলেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের অভাব-অভিযোগ ব্যথা-বেদনার সঙ্গে তাঁর এমন নিবিড় পরিচয় ঘটলো, যা তাঁকে চেতনার এক নূতন গ্রামে উন্নীত করে রাশিয়ার ভূমি সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত, উদারতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের প্রেরণা দিল। পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনায় এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই কাজে লেগেছিল। টলস্টয়ের বিভিন্ন বইয়ে, বিশেষ করে 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের লেভিন-আখ্যায়িকায় রুশ কৃষি ব্যবস্থার যে বিস্তারিত নিখুঁত বিবরণ পাই তার মূল তথ্যগুলি এই সময়কার অভিজ্ঞতা থেকেই চয়িত।

১৮৬২ সালে টলস্টয় বিবাহ করেন। পাত্রী তাঁদেরই জানাশুনা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, সোফিয়া বার, যাঁর সঙ্গে মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। টলস্টয়ের তখন বয়স চৌত্রিশ, সোফিয়ার আঠারো। নিতান্ত বালিকা হলেও বিদুষী বলতে হয়, কেননা টলস্টয়ের রচনাদি পড়েই সোফিয়া প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। টলস্টয়ের কুরূপ, কন্যার অনুরাগের বাধক হয়নি। বিদুষিতার সঙ্গে ছিল স্বাস্থ্য ও রূপের সম্পদ—নারীর ওই দুই প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য পুরুষের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গবৎ শান্ত রাখবার কাজে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছিল, যে কথার অসংশয় প্রমাণ মিলবে টলস্টয়ের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সংযত, অচঞ্চল আচরণের ধাঁচ-ধরন থেকে। দাম্পত্য জীবনের একেবারে শেষ দিকের শোচনীয় বিয়োগান্ত পর্বটি বাদ দিলে এ বিবাহ সুখের না হলেও মোটের উপর সোয়াস্তির হয়েছিল বলতে হবে।

বিবাহ টলস্টয়কে এক দায়িত্বশীল গৃহস্থে পরিণত করেছিল—সংসারের বিচিত্র

কর্তব্যের আহ্বানে নিষ্ঠার সঙ্গে সাড়া দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন উপযুক্ত আবেষ্টনী আর মনোমত জীবনসঙ্গিনী পেলে নিতান্ত উড়নচণ্ডী বেখেয়াল মানুষেরও স্বভাবের পরিবর্তন হয়, তিনি আর বাইরের পৃথিবীতে মনোযোগের রাশ আলগা করে দিয়ে কিংবা উড়ু-উড়ু প্রবৃত্তির দাসত্ব করে আগের মত তৃপ্তি পান না, স্থিতু হয়ে বসতে পারলেই তাঁর অন্তরের শান্তি। জমিদারীর আয়ও এই পর্বে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তা থেকেও বোঝা যায় জুয়ের নেশা বিবাহিত জীবনের পরিবেশে একেবারেই শমিত হয়ে এসেছিল।

সোফিয়া তাঁর স্বামীকে পরপর তেরটি সন্তান উপহার দেন। পুত্র কন্যা কলত্র দাসদাসী পোষ্য আশ্রিত ইত্যাদিতে মিলে রীতিমত এক জমজমাট সংসার। সাহিত্য সৃষ্টির জনকত্বেও এই পর্ব লক্ষণীয় ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ টলস্টয়ের সব কয়টি প্রসিদ্ধ বই বিবাহ-অন্ত ইয়াসনায়া পলিয়ানার এই সাধনপীঠে বসেই লেখা। প্রথমে লেখা হয় 'দি কশাক্স্' (১৮৬২) নামক গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী সম্বলিত আদিম কৃষি-ব্যবস্থার স্মারক এক বিষাদ-করুণ উপন্যাস। তার পর ১৮৬৩—৬৯ সালের মধ্যে লেখা শেষ হয় বিশ্ববিশ্রুত বৃহদায়তন উপন্যাস ওয়ার অ্যাণ্ড পীস। শোনা যায় বারবার কাটছাঁট পরিমার্জন করেও টলস্টয় তাঁর অভিপ্রেত রূপটিকে দাঁড় করাতে পারছিলেন না উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তের মধ্যে। তাই বারে বারে উপন্যাসটির সংস্কার করেছিলেন এবং যতবার নতুন করে সংস্কার করেছিলেন, ততবার পতিঅন্তপ্রাণ পত্নী পাণ্ডুলিপি নতুন করে নকল করে দিয়েছিলেন। কী সাংঘাতিক স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা! যেমন তেমন বই নয়, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর মত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত কমসে কম দুহাজার পৃষ্ঠার ঢাউস আকৃতির বই। এরকম ওজনের পাণ্ডুলিপি একবার নকল করতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়, আর এ তো বেশ কয়েকবারের ধাক্কা। অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক নেই, এর থেকেই বোঝা যায় পত্নী স্বামীর কতখানি অনুগতা ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী পুরুষ প্রভুত্বের দ্বারা এ জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না, স্বামীর গুণমুগ্ধতাই স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্লেশ স্বীকারের কারণ। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য, সোফিয়া বার নিজেও একজন ছোট-খাট লেখিকা ছিলেন। তিনিও স্বামীর অনুকরণে ডায়েরী রাখতে শিখেছিলেন এবং স্বামীরই ধাঁচে ডায়েরীর পাতার পর পাতা ভরাতে ভালবাসতেন। স্বামীর প্রতিভার দেশব্যাপ্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে স্ত্রীরও অংশীদারত্বের একটা ভাগ আছে এই চেতনাই সোফিয়া বারের কষ্টসহিষ্ণুতার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া গ্রন্থের বিত্ত আকর্ষণের ক্ষমতাও সংসার-আসক্তা নারীর আর্থিক প্রত্যাশাকে উচ্চকিত করেছিল বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে।

'আনা কারেনিনা' লেখা ১৮৭৫—৭৭ সালের মধ্যে। ওয়ার অ্যাণ্ড পীস এবং আনা কারেনিনা গ্রন্থকারকে প্রভূত খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থও এনে দিয়েছিল। বিবাহের কুড়ি বছরের মধ্যেই বই বিক্রির রয়্যালটি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন হয়েছিল বলে জানা যায়। জমিদারীর আয় বেড়েছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি। পত্নীর সংসার পরিচালন নৈপুণ্য ঐশ্বর্য বৃদ্ধির মূলে বড় কম সহায়তা করে নি। স্বামীকে সংসার ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে পারার কৃতিত্ব একান্তভাবে স্ত্রীর প্রাপ্য, সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

সত্তরের দশক থেকেই টলস্টয়ের মানসিকতার দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। টলস্টয়ের সত্তায় পরিচিত মানুষটি ছাড়া ভিন্নতর এক মানুষ যে গোড়া থেকেই লুকিয়ে ছিল তার প্রমাণ মিলতে থাকে। তিনি আর পূর্বের মত তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির জীবন থেকে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। সাংসারিক সাফল্যের কৃতিত্বে অথবা বিত্তের স্বাচ্ছল্যে আত্মপ্রসাদ ভোগ করার মত চিত্তের আহ্লাদ তিনি আর নিজের ভিতর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উপনিষদের গল্পের দুই পাখি যেমন একই গাছের ডালে বসে একটি আরেকটির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে, তেমনি টলস্টয়ের সত্তার বৈরাগী অংশ তাঁর সংসার অনুরক্ত অংশের উপর তীক্ষ্ন মনোযোগ নিক্ষেপ করে তাকে নিরাসক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করে আনতে ক্রমাগত চেষ্টা করেযাচ্ছিল বলে বোধ হয়। চিত্তের নবোদ্ভূত ঔদাস্যের টানে টলস্টয় সামাজিক সাফল্যের প্রচলিত ধারণার ভিতর আত্মসন্তুষ্টির বা সান্ত্বনার কারণ আর সন্ধান করে পাচ্ছিলেন না—তাঁর চোখে অস্তিত্বের অর্থ কিংবা জীবনের সার্থকতার মাপকাঠি বদলে যেতে শুরু করেছিল। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন ' প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা"। চেতনার ক্রমোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রান্তরিত টলস্টয়েরও অনুভব হতে লাগলো তাঁর প্রতিষ্ঠার জীবনে আর প্রয়োজন নেই, এখন থেকে সরল অনাড়ম্বর কায়িকশ্রমের জীবনই তাঁর সর্বথা আচরণীয় আদর্শ। ভোগের ক্লেদ বিষবৎ পরিত্যাজ্য, ততোধিক ঘৃণ্য জনজীবন থেকে বিযুক্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থময়তা। মানুষ তখনই সার্থকভাবে বাঁচে যখন সে বহুর সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, কেবলমাত্র আপনাকে কিংবা আপনার একান্ত নিকট জনদের নিয়ে বাঁচা, বেঁচেও মরে থাকার সামিল। আত্মসর্বস্বতা মানুষের চূড়ান্ত অভিশাপ।

টলস্টয়ের এই আত্মোন্মেষ সত্তরের দশকে লক্ষণীয় মাত্রায় চোখে পড়ে এক ভ্রমণ পর্ব সেরে বাড়ী ফিরে আসার পর। বিশ্রামের মানসে রাশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের ক্যারালিয়েক নামক গ্রামে গিয়েছিলেন বেড়াতে। সেখানে মোলোচান সম্প্রদায়ের লোকজনদের সঙ্গে পরিচয় হয়। মোলোচানদের জীবনধারা তাঁকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মোলোচানরা ধর্মভীরু ক্রীশ্চিয়ান, বাইবেল ছাড়া আর কিছু মানে না। চার্চের কর্তৃত্ব তারা স্বীকার করে না। তাদের সহজ অনাড়ম্বর নীতিপূর্ণ জীবনযাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করল। এদের সঙ্গে পরিচয় আর সংস্পর্শের পরে থেকেই দেখা গেল সংসারের প্রতি টলস্টয়ের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করেছে, ঈশ্বরের প্রতি ব্যাকুলতা বেড়েছে। জীবনের অর্থ অন্বেষণে তিনি অস্থির হলেন। লক্ষ্যের স্পষ্টতা তথা মহত্ত্ব না থাকলে জীবন ধারণের কোন মানে হয় না এই উপলব্ধির কিনারায় এসে পৌছলেন। মানুষের জীবনের দুটি স্তর—জৈবিক ও আত্মিক। জৈবিক ভাবে বেশী মগ্ন হয়ে পড়লে মানুষ ক্রমশঃ পশুত্বের দিকে নেমে যায়। আর আত্মিক দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ হলে ভগবানের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে, মানুষ ক্রমশঃ মহত্তর বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ঈশ্বরের রাজ্য মানুষেরই অন্তরে অবস্থিত।

কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদ অসঙ্গতি স্বতোবিরোধ বাদ দিয়ে বাইবেলই হয়ে উঠলো তখন থেকে তাঁর চলার পথের প্রকৃত নিয়ামক। তিনি যীশুর অবতারত্ব মানেননি কিন্তু তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব বলেছেন। যীশুর সরল জীবন তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। বাইবেলের উপদেশাবলীর মধ্যেও আবার 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস' —এর পাঁচটি সূত্র ছিল তাঁর কাছে ধ্রুবতারা স্বরূপ। এই পর্ব থেকে টলস্টয়ের জীবনের ছাঁচ একেবারেই বদলে গেল বলা যায়।

অবশ্য বিবাহের সূত্রপাতেই এই আশ্চর্য মানুষটির মধ্যে এক অদ্ভুত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সাংসারিক-জাগতিক মানদণ্ডে সবই এঁর কেমন যেন খাপছাড়া। খাপছাড়া তাঁর মনোভাব, খাপছাড়া তাঁর আচরণ। খাপছাড়া ব্যবহারের একটা দৃষ্টান্ত দিই।

বিবাহের পূর্ব-দিনগুলিতে যখন বাগ্‌দত্তার সঙ্গে প্রাক্-পরিচিতির (কোর্টশিপ) অধ্যায় চলছে তখন টলস্টয় জেদ ধরে বসলেন ভাবী বধূকে তাঁর ডায়েরী-গুলি পড়ে দেখতে হবে। এইসব ডায়েরীতে টলস্টয় তাঁর গত দিনের সমস্ত স্খলন-পতন-পাপ অকপটে ও অনুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আগেই লিখেছি যে, এই সব ডায়েরীরই সম্প্রসারিত শৈল্পিক রূপ হলো চাইল্ডহুড, বয়হুড প্রভৃতি তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থসমূহ।

টলস্টয় কেন তাঁর ভাবী পত্নীকে এই সব গতদিনের অধঃপতনের কাহিনী-গুলি পড়াবার জন্য গোঁ ধরেছিলেন ? একটাই তার কারণ। ভাবী স্বামী ভাবী বধূর কাছ থেকে কিছুই লুকোতে চান না, তিনি তাঁর আসল স্বরূপ গোপন করে পত্নীর মনে ভ্রম জন্মিয়ে পত্নীকে প্রতারণা করতে অনিচ্ছুক। স্ত্রীর চোখে নকল

হীরোর মর্যাদা নিয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করলে সেটা চরম মিথ্যাচারের তুল্য অপরাধ হবে। তিনি সেই অপরাধ এড়াতে চান। তাই টলস্টয়ের ইচ্ছা সোফিয়া সব কিছু জেনে বুঝে তাঁর যাবতীয় অতীত ক্রিয়াকলাপ বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করে তবে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিন। স্বামীর পাণি গ্রহণ করার আগে স্বামীর সর্ববিধ গতকালীন কুকর্ম খোলা বইয়ের পাতার মত স্ত্রীর চোখে অনাবৃত হওয়া দরকার। তার পরেও যদি তাঁর প্রতি সোফিয়ার অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে, বুঝতে হবে নারীর ভালবাসা দুরূহতম পরীক্ষার অগ্নিস্পর্শের পরেও অমলিন, অম্লান রয়েছে, সুতরাং ওই প্রেম একেবারে নিখাদ সোনা। এরূপ ক্ষেত্রে সাগ্রহেই তিনি সোফিয়াকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করে নেবেন।

সোফিয়া কিছুতেই রাজী হন না। যাঁর সঙ্গে আজ বাদে কাল তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে তাঁর গতদিনের বৃত্তান্ত জেনে তাঁর কী লাভ? এমনতর জ্ঞানোদয়ে তিনি কোন্ চতুর্বর্গ ফলের অধিকারিণী হবেন? বরং অজ্ঞতাই কি এ ক্ষেত্রে আশীর্বাদ নয়? কিন্তু টলস্টয় নাছোড়বান্দা। আচ্ছা গোঁয়ার মানুষের পাল্লায় পড়া গেছে যাহোক।

শেষপর্যন্ত সোফিয়াকে ভাবী স্বামীর সব কয়টি ডায়েরী পড়তে হয়েছিল, না পড়া পর্যন্ত তিনি রেহাই পাননি। সোফিয়ার পতিপ্রেমের প্রগাঢ়তার এর থেকে জাজ্জল্যকর প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, এই সব পিলে-চমকানো রোজনামচার চোখ-ছানাবড়া-হওয়া স্বীকারোক্তি পড়ার পরেও সোফিয়া টলস্টয়ের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর কম-বেশী একটানা সোয়াস্তি সুখে ঘর করেছিলেন, একেবারে শেষের দিকের কিছু অশান্তিময় দিনগুলি বাদে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়তার এও এক অন্যতর বড় প্রমাণ!

সন্দেহ নেই টলস্টয়ের উদ্দেশ্য ছিল সাধু কিন্তু কেমন যেন কিম্ভুত। ভাবী বধূকে গতদিনের ডায়েরী পড়াবার জন্য তাঁর জেদ তাঁর অভিপ্রায়ের সততা হয়ত প্রমাণ করে কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর জবরদস্তিমূলক মনোভাবেরও প্রমাণ দেয়। সব স্বামীরই অতীত ক্রিয়াকলাপ স্ত্রীর কাছে আর স্ত্রীর অনূঢ়া বয়সের ক্রিয়াকলাপ স্বামীর কাছে উদ্ঘাটিত হওয়া চাই—বিবাহের এক অপরিহার্য পূর্ব সর্ত হিসাবে এই যদি নিয়ম হয় তাহলে আর নির্ঝঞ্ঝাটে আধুনিক দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হতো না। শতকরা নব্বুইটি পরিবারের বেলায় এর ফল বিষময় হতো। টলস্টয়ের প্রাক্তন ক্রিয়াকলাপ না জানা পর্যন্ত ভাবী পত্নীর জ্ঞানের ভাণ্ডার অপূর্ণ থেকে যাবে এমন মাথার দিব্য টলস্টয়কে কে দিয়েছিল?

আসলে এই যুগন্ধর প্রতিভার ধারক বাহকের সব কিছু কাজের মধ্যেই ছিল

গতানুগতিহীনতার স্পর্শ। সমালোচকেরা বলেছেন মহামানবের আদর্শ প্রচারের ধরনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা জুলুমের ভাব লুকিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে তিনি অহিংসার তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তাও করেছেন সহিংসভাবে। He was violently non-violent। শিল্পের তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তাও করেছেন চূড়ান্ত রকমের পিউরিটান ভাবকে আশ্রয় করে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভাবী পত্নীর কাছে সাধু সাজতে চেয়েছেন কিন্তু জবরদস্তির শরণ না নিয়ে সেটা করতে পারেননি। জীবনের গোড়া থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একই মাত্রাহীন আতিশয্যের খেলা দেখতে পাই তাঁর জীবনে। কখনও আতিশয্য এ প্রান্তে, কখনও ওই প্রান্তে। পাল্লা কখনও এদিকে ভারী, কখনও ওদিকে। বিপরীতের লীলায় ভরপুর তাঁর চরিত্র। উচ্ছৃঙ্খলতা যখন করেছেন, চুটিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা করেছেন। ভদ্র গৃহস্থ যখন সেজেছেন, গার্হস্থ্যের একেবারে হদ্দ করে ছেড়েছেন। পিতা রূপেও তাঁর জনকত্বের রেকর্ড তুঙ্গস্পর্শী বলা যায়। একটি নয় দুটি নয়, তেরটি সন্তানের তিনি পিতা এবং সে সব সন্তানের গর্ভধারিণী একজনাই। পূর্বকৃত পাপতাপের জন্য যখন অনুশোচনা করতে আরম্ভ করেছেন, সেই অনুতাপের আগুনের ছটায় চোখ ঝলসে যাবার যোগাড়। চিত্তে যখন বেদনার মন্থন শুরু হয়েছে, সেই বেদনার দাপে চারদিককার মাটি কেঁপে উঠেছে। নিজের সংসারে তো বটেই, গোটা রাশিয়ার সমাজে তার আলোড়ন উঠেছে।

অর্থাৎ, আধখেঁচড়া ভাবে কাজ করা টলস্টয়ের ধাতে ছিল না। তিনি ছিলেন সীরিয়্যসমনা ভাবুক। সবকিছুতেই পরিপূর্ণতার সন্ধান করতেন। ফলে তাঁর সব কাজের মধ্যেই একটা চূড়ান্ত অতিরেকের ভাব ফুটে উঠতো—সে কি আচরণের এ প্রান্তে কি ওই প্রান্তে। প্রান্তীয় আতিশয্য তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন ছিল বললেও চলে।

ক্যারালিয়েফ গ্রামের মোলোচান সম্প্রদায়ের লোকেদের সরল জীবনযাত্রার আদর্শের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অভিজ্ঞতার পর বাড়ী ফিরে এসে টলস্টয় যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বনে গেলেন! অন্তর্দ্বন্দ্বে সতত-ক্ষতবিক্ষত হওয়া তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, এবারে তার সঙ্গে যুক্ত হলো অসামান্য একটা ব্যাকুলতার ভাব—ধনুকের ছিলা আকর্ষিত হতে হতে তা এতটাই টান-টান অবস্থায় এসে দাঁড়ালো যে ধনুর্ভঙ্গ হবার উপক্রম হলো। টলস্টয়ের পিছনে ফিরবার আর রাস্তা রইলো না, পুরাতন জীবন রীতির সঙ্গে আপস করে চলার সমস্ত সম্ভাবনাই বিলুপ্ত হলো।

এই পর্বে এসেই আমরা দেখলুম মানুষ টলস্টয় শিল্পী টলস্টয়কে অনেকগুণ

ছাড়িয়ে গেছেন। যিনি এতকাল একান্তরূপে লেখক পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন তাঁর সত্তায় এখন মনুষ্যত্বের মহিমা যুক্ত হলো—তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের গোত্রান্তর ঘটলো। সাহিত্যকীর্তি টলস্টয়কে প্রচুর খ্যাতি ও বিত্ত এনে দিয়েছিল, কিন্তু এই দুই জাগতিক বস্তুর প্রতি তিনি আর আগের মত আকর্ষণ অনুভব করতে পারছিলেন না। বরং এগুলির সম্পর্কে তাঁর মনে উত্তরোত্তর বিতৃষ্ণার বোধই জেগে উঠতে থাকলো। খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁর নিকট মরীচিকা-সদৃশ মনে হলো।

আর শুধু খ্যাতি-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত বলে কথা কেন, খোদ্ সাহিত্যকর্ম বস্তুটাই তাঁর চোখে গুরুত্ব হারাতে বসলো। অন্ততঃ, যে জাতীয় সাহিত্যকর্মে তিনি এতকাল আপনাকে ব্যাপৃত রেখে এসেছেন তার অনুশীলনে তিনি আর আগের মত অর্থময়তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কেন জানি মনে হতে লাগলো এ জাতীয় সাহিত্যচর্চা করবার কোন মানে হয় না, এ শুধু অলস ধনী বিলাসী শ্রেণীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়। সমাজের উপর-তলার নরনারীদের ভোগ সুখের স্পৃহাকে কণ্ডুয়ন করবার জন্য যে সাহিত্যের সৃষ্টি—টলস্টয় আপন সাহিত্যকেও এই কোঠায় ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি,—সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টির মানদণ্ডে তেমন সাহিত্যের কানাকড়ির মূল্যও নেই। টলস্টয় তাঁর হোয়াট ইজ আর্ট? বইতে এ জাতীয় সাহিত্যকে সুখান্বেষণ-স্পৃহার আদর্শের (Pleasure Principle) উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য আখ্যা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ওই শ্রেণীর রচনাকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দেননি তিনি।

টলস্টয়ের বিচারে সত্যিকার সাহিত্য হবে জনগণমুখী, সাধারণ মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। আমোদপ্রয়াসী ভোগী সমাজের মানুষদের চটুল জীবনাসক্তির সঙ্গে তাল রেখে তদনুরূপ ভাবভঙ্গীর সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা তাদের চিত্তবিনোদন প্রকৃত সাহিত্যের কাজ নয়। যে সাহিত্য পড়ে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত বোধ করে না, যে সাহিত্য তাদের বোধ-বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে বাহ্বাস্ফোটময় শূন্যগর্ভ বাক্যবিলাসেই কেবলমাত্র পর্যবসিত হয়, সে সাহিত্য নামী-দামী লেখকের লেখা হলেও তার হৃদয়-সংক্রমণের ক্ষমতা অত্যন্ত কম সুতরাং মূল্যহীন। কোন্ লেখার কতটা 'ইনফেক্‌শন'-এর শক্তি তাই দিয়েই তার গুণাগুণের তারতম্য নিরূপণ করতে হবে। মহলবিশেষের কাছে চটকদার সাহিত্যের বিশেষ কদর থাকলেও তার প্রকৃত দর অতি সামান্য।

টলস্টয়ের মতে, কাব্যের আবেদন হওয়া উচিত সহজ সরল প্রত্যক্ষ, জনগণের হৃদয়ের ভাষায় তার প্রকাশ হলে তবেই তার সার্থকতা। কাব্যের আবেদন

অযথা অলঙ্কার ভারাক্রান্ত কিংবা অর্থশূন্য শব্দবৈভবে মণ্ডিত করে তাকে নিছক নান্দনিক গুণ সম্পন্ন বা বিদগ্ধ করে তোলার কিছুমাত্র সার্থকতা দেখা যায় না। নাটকের আবেদন হবে শান্তরসাস্পদ হার্দ্য প্রাণময়—মিছিমিছি খুনের কোলাহল সৃষ্টি করে তার দৃশ্যাবলীকে বীভৎস বানিয়ে তোলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এমনকি এই মানদণ্ডে তিনি শেকসপীয়্যরের নাটকেরও বিরূপ সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। জীবনের শেষের দিকে (১৯০৩) প্রকাশিত 'অন শেকসপীয়্যর অ্যাণ্ড দি ড্রামা' বইতে তিনি শেকসপীয়্যরের নাট্যাবলীর জিঘাংসা-প্রীতির নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। কতখানি বিশ্বাসের জোর ও বুকের পাটা থাকলে শেকসপীয়্যরের মত অমর নাট্যস্রষ্টার শিল্পকেও সমালোচনার শরে বিদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ এই বই। টলস্টয়ের শেকসপীয়্যর সমালোচনা কতটা যৌক্তিক অথবা কতটা অযৌক্তিক সেটা কথা নয়, কথা হলো দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে উনিশ শতকের টলস্টয় ষোল শতকের শেকসপীয়্যর থেকে বহু শত যোজন দূরে অবস্থিত ছিলেন সে অতি প্রত্যক্ষ। শুধু কালের ভিন্নতা অথবা দেশের ভিন্নতা দিয়ে এ জিনিস বোঝানো যাবে না, এর মূলে আছে শিল্পদৃষ্টির মৌলিক ব্যবধান।

ছোটগল্পের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টলস্টয় জানালেন, ছোটগল্প হবে বাইবেলের প্যারাবলের মত সহজ সরল অজটিল। শুধু আদর্শ প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন না, নিজে হাতে-কলমে লিখে তেমন গল্পের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর শেষ বয়সের লেখা 'টুয়েন্টি-থি্-টেলস'-এর গল্পগুলি এ কথার প্রমাণ। বাইবেলীয় নীতিগল্পের আঙ্গিকে লেখা এই সব গল্পে শ্রমজীবী মানুষের সরল জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষ করে কায়িক শ্রমের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বজনমনের উপর গল্পগুলির প্রভাব অবিস্মরণীয় বলা যায়। "বোকা আইভান", "বাঁচবার জন্য মানুষের কয় হাত জমি দরকার?", "দুই বৃদ্ধ" প্রভৃতি গল্প আজও গোটা দুনিয়াভর গভীর আগ্রহে পঠিত।

ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। যে-মহান্ শিল্পী টলস্টয় ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, আনা কারেনিনা প্রভৃতি উপন্যাস লিখে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তিনি বলছেন তাঁর এসব রচনা কিছুই হয়নি—এসব বই অসার প্রমোদবিলাসী ধনী-শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য লেখা! শুধু তাই নয়, তিনি এগুলির গ্রন্থকর্তৃত্ব অস্বীকার করতে চাইলেন এবং ওই বাবদে প্রাপ্য রয়ালটির টাকা জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পত্নী ও সন্তানগণের বাধাদানের ফলে তিনি এই সৎ সংকল্প শেষ পর্যন্ত কার্যকর করতে পারেননি। শেষে স্থির হয়

১৮৮১ সালের পর থেকে যে বইগুলি লেখা হয়েছে বা হবে তার উপর আর তিনি গ্রন্থস্বত্ব দাবি করবেন না, সেগুলি সাধারণের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেগুলি সাধারণের মধ্যে বিলোতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পত্নীর প্রচণ্ড আপত্তির ফলে ওই দানকার্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

স্ত্রীর যুক্তি ছিল এই রকম : তিনি নিজের জন্য সম্পত্তির ভাগ চাইছেন না, তাঁর ভোগসুখের বয়স গিয়েছে তিনি সম্পত্তি দিয়ে কী করবেন? কিন্তু তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন তো ফুরোয়নি। সন্তানদের মুখ চেয়েই তাঁকে কঠোর হতে হচ্ছে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যখন সংসারে থাকবেন না, তখন সম্পত্তির অভাবে ছেলেমেয়েদের কী গতি হবে? জমিদারের পুত্রকন্যা জমিদারী হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াক এই কি আদর্শপাগল স্বামী চান? টলস্টয়ের পুত্রকন্যা অর্থাভাবে ভিখারী দশা প্রাপ্ত হলে তাতে কি মহাত্মা টলস্টয়ের গৌরব বাড়বে?

শতকরা নিরানব্বুইটি সংসার-আসক্তা সন্তান-অন্তপ্রাণ নারী যে-যুক্তি প্রয়োগ করে থাকেন,সোফিয়া বারের যুক্তিক্রম তার থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না। মোক্ষম যুক্তি, তার উপরে ওই যুক্তিশায়কে আরও বেশী তীক্ষ্ণতা এসেছিল জননীর অশ্রান্ত চোখের জলে, বিরামহীন কাতরোক্তিতে। সোফিয়া মাঝে মাঝে আত্মহত্যারও ভয় দেখাতেন। সুতরাং স্বামীর কাবু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রজাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন বা বিতরণের সাধ অতৃপ্ত রেখেই তাঁকে এ মর-সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল শেষ অবধি।

চিত্তের যখন এই অস্থির-অশান্ত-অতৃপ্ত অবস্থা তখন অন্তরে চলল প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বের আলোড়ন ও নিরবধি আত্মসমীক্ষণ সঞ্জাত বিচারমন্থন। এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। ভারতীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ আদিও পড়লেন। ছাত্রাবস্থায় এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবারে সে ছাড়াও অন্যান্য ধর্মদর্শনের চর্চা করলেন। কিন্তু কোন ধর্মগ্রন্থেই তাঁর চিত্তের জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজে পেলেন না। এমনকি তাঁর অতিপ্রিয় যীশুর ধর্মও এই সংকটে তাঁকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারল না। প্রত্যেকটি প্রচলিত ধর্মের দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে তিনি সমাধানের উপায় সন্ধান করলেন কিন্তু সমাধান তার অধরাই রয়ে গেল। মানুষ কেন বাঁচবে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি চূড়ান্ত বিহ্বলতার সীমানায় এসে উপনীত হলেন।

মনের অবস্থা যখন এমনি বিভ্রান্ত ও সান্ত্বনাহীন তখন আত্মহত্যার ইচ্ছা

জাগল। আর সত্যি সত্যি তিনি নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছিলেন একদিন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর আত্মহত্যা করা হয়নি। পৃথিবীর মহা ভাগ্য যে, এক মস্তবড় ফাঁড়ার কবল থেকে সেদিন এই গ্রহ রক্ষা পেয়েছিল।

চিত্তের এমনতর উদ্বেল উতরোল অবস্থাতেই টলস্টয়ের নিছক শিল্পী সত্তা থেকে দার্শনিক সত্তায় রূপান্তরণ। ছিলেন গল্পোপন্যাসের প্রথিতযশা লেখক, হয়ে দাঁড়ালেন জীবনের মৌলিক প্রশ্নাদির সদুত্তর সন্ধানী এক মহাভাবুক ও চিন্তানায়ক। ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে ওই শতকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কমবেশী কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন তার বেশীর ভাগই হলো চিন্তা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। যথা, 'এন এগজামিনেশন অব ডগম্যাটিক থিয়োলোজি' (১৮৮০), 'মাই কনফেশন' (১৮৮১), 'হোয়াট আই বিলিভ' (১৮৮৩), 'হোয়াট দেন মাস্ট উই ডু ?' (১৮৮৫), 'অন লাইফ' (১৮৮৬), 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' (১৮৯৩), 'দি টীচিং অব ক্রাইষ্ট' (১৮৯৬), এবং এই পর্বের সর্বশেষ গ্রন্থ রচনা করেন 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' (১৮৯৮)।

অবশ্য এই দুই দশক কালের ভিতর তিনি যে সৃষ্টিধর্মী বই লেখেননি এমন নয়। যেমন লিখেছেন 'দি ডেথ অব আইভান ইলিচ' (১৮৮৩), 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' (১৮৮৬), 'দি ক্রুশজার সোনাটা' (১৮৯১), 'দি ডেভিল' (১৮৯২), এবং সবশেষে 'রিসারেকশন' (১৮৯৯)। এগুলির ভিতর রিসারেকশন উপন্যাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সমালোচকদের মতে এটিই টলস্টয়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস—কি বিষয়বস্তুর গৌরবে কি শিল্পগুণে। এক আমোদসন্ধানী ভোগী যুবকের কামুকতার স্তর থেকে আত্মশুদ্ধির স্তর বেয়ে ত্যাগে মহীয়ান্ হয়ে ওঠার কাহিনী (গ্রন্থকারের স্বীয় জীবনের আদলে রচিত কিনা এর আখ্যানভাগ, কে বলবে ?)।

হিসাব থেকেই দেখা যায় এই বিশ বছর কাল মধ্যে চিন্তামূলক রচনারই প্রাধান্য। টলস্টয় সাহিত্য থেকে সরে গিয়ে ক্রমশঃ দার্শনিকতার জগতে চলে যাচ্ছেন এমনতর আশঙ্কা সেই সময় কারও কারও মনে উদয় হয়েছিল। আশঙ্কাটিকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। কেননা টলস্টয়ের মনের ঝোঁক তখন দার্শনিকতার দিকেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। টুর্গেনিভ তো খোলাখুলিই তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন এ সব ধর্মমোহ আর দার্শনিক কূট তত্ত্বের আলোচনা—টুর্গেনিভের ভাষায় কূটকচালি—ছেড়েছুড়ে দিয়ে টলস্টয় যেন সাহিত্যে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পরিপূর্ণতার আদর্শে যিনি দীক্ষিত, আপনাকে সব দিক থেকে

নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার সাধনায় যিনি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, তিনি কেন একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে নিয়ে পড়ে থাকবেন? তিনি কেন একই সঙ্গে উভয়কে নিয়ে চলতে পারবেন না? সাহিত্য এবং দার্শনিকতা, শিল্প এবং মনন—এই দুই বস্তু একই কালে কেন তাঁর মনোহরণ করতে পারবে না?

টলস্টয় তাঁর বন্ধুর অনুরোধ পূরণ করে তাঁকে বাধিত করেননি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিল্প ও চিন্তাচর্চা এই দুই ঘোড়া জুতে নিয়েই তিনি তাঁর জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে গিয়েছিলেন। যখন এই শতকের গোড়ার দিকে অনবদ্য সব ছোটগল্প ও কিছু নাটক লিখেছেন তখন একই সঙ্গে চলেছে তাঁর চার্চের বিরুদ্ধে জেহাদ, দুখোবর নামক এক আত্মবিশ্বাসনিষ্ঠ ত্যাগব্রতী সংখ্যালঘু ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে চার্চ এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ, শেক্সপীয়ারের নাটকাবলীর সমালোচনা, বিভিন্ন নীতিকথার সংকলন 'দি সার্কল অব রীডিং' সম্পাদনা, মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য ভারতবর্ষীয় জিজ্ঞাসুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা, ইত্যাদি।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, টলস্টয় রিসারেকশন উপন্যাসের মাধ্যমে এবং অন্যত্র দুখোবরদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন বলে রুশ অর্থোডক্স চার্চ তাঁকে তাঁদের ধর্মসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত করেন (১৯০১)। ইতঃপূর্বে দুখোবরদের দুই নেতা চার্টকভ ও বিরুকভকে তাঁরা সম্রাটকে দিয়ে দেশ থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা করিয়ে ছিলেন (১৮৯৮)। ধর্মের গোঁড়ামি কতটা নীচ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ হতে পরে এ ঘটনা তারই প্রমাণ। টলস্টয়ের মৃত্যুর পরেও রুশ চার্চ তাঁর উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে ক্ষান্ত হয় নি। টলস্টয়ের পরিবারের লোকদের ভুল স্বীকারে বাধ্য করিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছিল।

রুশ ধর্মমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর টলস্টয় তাঁর অনুরাগী ও সমর্থকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টেলিগ্রাম পান। প্রতিটি তারবার্তার মূলকথা হলো—'আমরা তোমার পিছনে আছি।' কিয়েভ টেকনিকাল স্কুল থেকে একটি পত্র এসেছিল যাতে এক হাজারের উপর ছাত্রের স্বাক্ষর ছিল। এক কাঁচের কারখানার কর্মীবৃন্দ তাঁকে একটি বৃহৎ কাচখণ্ড পাঠান যাতে নীচের কথাগুলি ঢালাই-করা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত ছিল—

"পরম শ্রদ্ধেয় লেভ নিকোলায়েভিচ, যে সমস্ত মহামানব তাঁদের নিজ নিজ যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন তুমি তাঁদেরই ভাগ্য বরণ করে নিলে। বিগত কালে এঁদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কিংবা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয়েছে অথবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। ধর্মান্ধ গোঁড়ার দল ও

পণ্ডিতম্মন্যের দল তাঁদের খুশীমত যেখান থেকেই তোমাকে বহিষ্কৃত করুন না কেন, রুশ জনগণ সর্বদাই তোমার জন্য গর্ববোধ করবে, তাদের কাছে তুমি চিরদিনই থাকবে মহান, প্রাণপ্রিয়, পরমাত্মীয়।"

ধর্মসঙ্ঘ থেকে টলস্টয়ের বহিষ্কারের প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯১০ সালে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে লেনিন লিখলেন—

"রুশ ধর্মযাজক সঙ্ঘ টলস্টয়কে তাঁদের মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করেছেন। ভালই হয়েছে। এইসব খৃষ্টীয় ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতের দল, ইহুদী-বিরোধী নির্যাতন এবং জারের 'ব্ল্যাক হাণ্ড্‌ড' চণ্ডবাহিনীর অত্যাচার-নিষ্পেষণ সমর্থনকারী। নিষ্ঠুর জল্লাদশ্রেণীর বিরুদ্ধে যখন হিসাব-নিকাশ করার সময় হবে তখন এই ঘটনার স্মৃতি আমাদের কাজে লাগবে।"

দেখা যাচ্ছে টলস্টয় নিজেকে আর শিল্পের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, ওই সংকীর্ণ গণ্ডীর পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর চিন্তার জগতে উত্তীর্ণ হয়ে একদিকে গতানুগতিক অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্তি অন্যদিকে গণমানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে উঠেছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন তার কয়েকটি মণিখণ্ড হলো—

(১) প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বাস। বিবেকের নির্দেশ মেনে চললে পথ কখনো ভুল হবে না।

(২) সরল জীবনই সুখের জীবন। কায়িক শ্রমই সকল শ্রমের সার। নিজের কাজ নিজে করবে, পরের উপর নির্ভর অথবা অন্যের পরিশ্রমের উপর ভাগ বসাবে না।

(৩) কারও ভাল করতে চাওয়াই যথেষ্ট নয়, তার প্রতি অন্তরে অন্তহীন ভালবাসা পোষণ করা আবশ্যক। প্রেমহীন সমাজসেবা নিষ্ফল।

(৪) ঘোষণায় ও আচরণে সঙ্গতি থাকা চাই। কথা ও কাজের অমিল অপরকে এবং নিজেকেও প্রতারণার সামিল।

(৫) অন্যায়ের প্রতিরোধ নয়, অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করলেই অন্যায় প্রতিরুদ্ধ হয়। অন্যায়কারীর সংস্রব বর্জন করাই তাকে নিরস্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

(৬) রাষ্ট্রমাত্রই নিপীড়নের যন্ত্র। দণ্ডশক্তির উপর তার নির্ভর। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সুখে শান্তিতে বাস করবার প্রাথমিক সর্ত।

(৭) পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো প্রত্যেক নাগরিকের আত্মোন্নতি, তার নীতিবোধের বিকাশ।

(৮) ভাল লেখার তিনটি লক্ষণ: সরলতা, আন্তরিকতা ও বাহুল্যবর্জন। যে সাহিত্যপাঠে জনগণের কোন কল্যাণ হয় না, তেমন সাহিত্য নিরর্থক।

এসব এবং এমনি ধরনের আরও সব মূল্যবান সুভাষিতাবলীতে টলস্টয়ের শেষ বয়সের রচনা পূর্ণ। সব কথাই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজসত্যের মাপকাঠিতে সমান গ্রহণীয় তা নয়। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে খুবই প্রণিধানযোগ্য এ সকল উক্তি তাতে সন্দেহ নেই। টলস্টয়ের এসব চিন্তার প্রভাব এমনি দূরব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল যে বহুলোক তাঁর কাছে প্রত্যহ আসত তাঁকে দেখতে, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ-পরামর্শ অনুযায়ী জীবনকে নতুন করে গড়ার প্রেরণা পেতে। শোকে সান্ত্বনা, সংকটে আলোর দিশা লাভের কামনা একাধিক জনকে তাঁর নিকট আকর্ষণ করে নিয়ে আসত প্রতিদিন। টলস্টয় তাঁর জীবদ্দশাতেই এক প্রবাদকথিত মহাপুরুষে পরিণত হতে চলেছিলেন। ঋষিত্ব তাঁর কুলভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলা চলে। অনেকে তাঁর আদর্শানুযায়ী নানা জায়গায় কলোনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল, টলস্টয় সম্মতি দেননি। তাঁর কথা ছিল, সত্য স্বয়ম্প্রকাশ, ব্যক্তিগত আচরণের মধ্য দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। আখড়া বানিয়ে সত্য প্রচার করা যায় না। (অবশ্য মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয়ের আদর্শ অনুযায়ী দুটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন।)

এখন থেকে টলস্টয়ের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। রোজ সকালে উঠে মাঠে যান, চাষীদের সঙ্গে একত্রে ক্ষেতের কাজ করেন। পোশাক একেবারে রুশ 'মুঝিকের' মত সাদামাঠা আটপৌরে, মাথায় 'পাৎলা', পায়ে মোটা চামড়ার জুতো, পরনে শীতনিবারণী পশুলোমের অঙ্গাবরণ। কায়িক শ্রমের নীতিতে যেমন অভ্রান্ত বিশ্বাসী তেমনি বাইবেলের এই নীতি-উপদেশ "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নের সংস্থান কর"—সে কথাও অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলতে যত্নশীল। তাই তাঁকে অন্ন সংস্থানের উপায় হিসাবে একটি জীবিকা বেছে নিতে দেখা যায়—চর্মকারের জীবিকা। তিনি নিজে হাতে জুতো সেলাইয়ের কাজ শিখে নিলেন আর সত্যি সত্যি নিজের জুতো নিজেই সারাই করতে লাগলেন। আরাম আয়েসের অভ্যাসযুক্ত জমিদারের জীবন পরশ্রমপুষ্ট তথা পরস্বাপহরকের জীবন—এই বোধ মনে প্রতীত হতে তিনি স্বয়ং পরিশ্রম না করে অন্ন গ্রহণ করবেন না এই ব্রত নিয়েছিলেন। আমাদের গীতাতেও আছে পরিশ্রম না করে অন্ন গ্রহণ চৌর্যের তুল্য অপরাধ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিবেকী লেখকের কাছে তাই সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হয়ে থাকাটাই যথেষ্ট মূল্যবান কাজ বলে বিবেচিত হয়নি, তার উপরে শারীরিক শ্রমের কাজকে তিনি অপরিহার্য জ্ঞান করেছিলেন। তাঁর

'টুয়েণ্টি-থি, টেলস'-এর গল্পগুলিতে প্রায়শঃ যে মুচির জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—বানানো কাহিনী নয়।

অবশ্য বলা হতে পারে সাহিত্যরচনার কাজে যে মস্তিষ্কচর্চা হয় সেইটাই কি পর্যাপ্ত পরিশ্রমের কাজ নয়? তার উপরে আবার হাতের কাজে সময়ক্ষেপের কী দরকার? এইখানেই গড়পড়তা সাহিত্যজীবীদের সঙ্গে টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। তিনি নিছক মস্তিষ্কজীবিতাকে আশীর্বাদ ভাবতেন না, অভিশাপ বলেই মনে করতেন। তার উপরে অসার সাহিত্যচর্চা তাঁর চোখে আলস্য বিলাসেরই সমতুল ছিল।

১৮৮১ সালে ব্যক্তিজীবনে মৌলিক পরিবর্তনের পর টলস্টয় তাঁর পারিবারিক জীবনযাত্রার ধরন-ধারণের আমূল রূপান্তরের উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে যে-পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁর মূল কথাগুলি হলো এই—

"ইয়াসনায়া পলিয়ানায় বাস। সামারা প্রদেশে যে-জমিদারী রয়েছে তার আয় গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। সামারার স্কুলগুলি চালানোর জন্যও অর্থ সংরক্ষিত রাখতে হবে। টাকা কী ভাবে খরচ হবে তা প্রজারা নিজেরাই স্থির করবেন। নিকোলস্কোয়ে খামারের জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার পর তার আয়েরও পূর্বোক্ত ধরনের বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত কিছুকাল ইয়াসনায়া পলিয়ানার জমিদারীর আয়, দুই থেকে তিন হাজার রুবলের মত হবে, আমার এবং আমার স্ত্রীর এবং আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য সংরক্ষিত রইলো।···আর আমাদের তিন বয়স্ক সন্তানদের কথা বলতে গেলে, তারা হয় সামারা কিংবা নিকোলস্কোয়ে খামারের প্রজাদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য বুঝে নেবে, অথবা সেখানে থেকে যাতে প্রজাদের হাতে খরচ-খরচার যথাযথ বিলি-ব্যবস্থা হয় তার তদারকি করবে, নয় আমাদের এখানে থেকে আমাদের সাহায্য করবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা জীবনের কাছ থেকে কম দাবী দাওয়া করতে অভ্যস্ত হয়। তাদের কেবলমাত্র কিতাবী বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা না করে যেদিকে যার সহজ নৈপুণ্য রয়েছে তাকে সেই শিক্ষা দিতে হবে—সেই সঙ্গে কায়িক শ্রম শেখাতে হবে। বেশী চাকরবাকর রাখা চলবে না, পরিবর্তিত জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে-কয়জনার সাহায্য না হলেই নয়, কেবল সেই কয়জনকেই কাজে বহাল রাখতে হবে। তাও নিজেরা স্বয়ংনির্ভর হলে তাদের ছাড়িয়ে দিতে হবে। সবাইকে একত্র বাস করতে হবে : পুরুষেরা এক ঘরে, মেয়েরা আর এক ঘরে। একটি ঘর হবে লাইব্রেরী ঘর, সকলের পড়াশুনা তাতে চলবে, অন্য

আর একটি ঘর হবে কাজ-ঘর—প্রত্যেকের কায়িক শ্রমের কেন্দ্র। বাড়তি হিসাবে পীড়িতদের জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। আহার নিদ্রা অধ্যয়ন ব্যতিরেকে কাজের ধারা হবে এই রকম—শরীর শ্রম, চাষবাস, দুঃস্থদের খাদ্যবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা, চিকিৎসা এবং শিক্ষকতা। রবিবারগুলিতে গরীব ও ভিখারীদের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া সন্ধ্যায় পড়াশুনো, আলাপ-আলোচনা। জীবনযাত্রা, খাদ্য পরিচ্ছদ সব যতদূর সাধ্য সরল করে তোলা চাই। যা কিছু অনাবশ্যক : যেমন, পিয়ানো, আসবাবপত্র গাড়ী-ঘোড়া—সব বেচে দিতে হবে কিংবা বিলিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞান এবং আর্ট ইত্যাদি শিক্ষার বেলায়, কেবলমাত্র সেইগুলিই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে হবে যেগুলির সুফল সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা যায়। প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে—তা তিনি গভর্নরই হোন আর একজন ভিখারীই হোন। মূল লক্ষ্য হবে—কল্যাণ, স্বকীয় কল্যাণ এবং পরিবারের কল্যাণ। বুঝতে হবে কল্যাণ বা সুখ নিহিত আছে অল্পে তুষ্টির মধ্যে এবং অপরের ভাল করার মধ্যে।"

চমৎকার আদর্শ, কিন্তু স্পষ্টতঃই কাজে পরিণত করা কঠিন। টলস্টয় চাইলেও অন্যদের সে বিষয়ে রাজী করানো শক্ত হতো। আর সেটা যে কী পরিমাণ শক্ত ব্যাপার সে তো টলস্টয় পরবর্তীকালে নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজেই খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন। বস্তুতঃ পরিবারের মানুষদের তাঁর মনোমত আদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজবার চেষ্টা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদই হয়ে গেল। সে কাহিনী বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক।

টলস্টয় চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের বিধি অনুযায়ী একটা বয়সে সংসার থেকে বিদায় নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন কিন্তু পারিবারিক বন্ধনের জন্য পারেননি। সংসারই তাঁকে সাংসারিক দায়িত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়নি। চেয়েছিলেন সম্পত্তি বিলিয়ে রিক্ত হতে, স্ত্রীই প্রধান বাধা হয়ে ওঠেন ওই ইচ্ছা পূরণের পথে। বস্তুতঃ স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে শেষের দিকে খিটিমিটির অন্ত ছিল না। নিত্যদিন এ ব্যাপারে অশান্তি লেগে ছিল।

টলস্টয় যদিও স্ত্রীকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাঁর সম্পত্তি ত্যাগের কোনই অভিপ্রায় নেই, তাহলেও স্বামী ও সম্পত্তির অধিকারবোধে আচ্ছন্না সোফিয়ার সংশয় কিছুতেই ঘুচতে চাইছিল না। স্বামীর যা মেজাজ-মরজি, স্বামী যদি আকস্মিক এক উদ্বেল উদারতার বশে গোটা সম্পত্তি দান-খয়রাত করে বসেন আর ওই মর্মে উইল করে যান তাহলে কী হবে? টলস্টয় যত বলেন

তাঁর সেরকম কোন উদ্দেশ্যই নেই, তাতেও স্ত্রীর সন্দেহাতুর মনের দ্বিধা দূর হতে চায় না। স্বামী না হয় সত্যিই সম্পত্তি বিলোতে চান না, কিন্তু যে সব লোক সর্বক্ষণ স্বামীকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে ও তাঁর কানে নিয়ত ফুসুর-ফাসুর গুজুর-গাজুর মন্ত্র জপতে ব্যস্ত, তাদের বিশ্বাস কী? সোফিয়া স্বামীর এই ভাবজগতের সঙ্গীদের দু' চক্ষে দেখতে পারতেন না। এই সব সাঙ্গপাঙ্গের দল নিত্যদিন ত্যাগের মন্ত্র জপাতে জপাতে তাঁর স্বামীর মাথা খারাপ করে দিচ্ছে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। তিনি এঁদের বাড়ী থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু তিনি অসহায়। এঁরা যে সব স্বামীর বড়ই প্রিয় পাত্র, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন তার কি যো আছে? স্বামী কি তাহলে আর তাঁকে আস্ত রাখবেন?

সাংসারিক অশান্তি এই ভাবে ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছিল। টলস্টয় প্রবল মানসিক যাতনায় কাল কাটাচ্ছিলেন তবুও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। প্রবল ভালবাসার শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে জয় এবং স্বপথে আনয়ন করবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। কিন্তু ওই মহান্ সংকল্পের দৃঢ়তায় চিড় ধরল যখন স্বামী দেখলেন একদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে চুপিচুপি তাঁর বাক্স প্যাটরা হাতড়াচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রী অনেক দিন যাবৎ আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্ত্রী ভেবেছিলেন স্বামী গাঢ় ঘুমে বিভোর, সেই অবসরে ঘরে ঢুকে তোরঙ্গ হাতড়ে উইল খুঁজে বার করাই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। উদ্দেশ্য উইলে স্ত্রী সন্তানদের বঞ্চিত করে বদান্য স্বামী দেশবাসীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাদের উদ্দেশে দান-খয়রাতে মেতে উঠেছেন কিনা সেটা সরাসরি পরখ করে দেখা।

স্বামীর এমনিতেই চোখে ঘুম ছিল না, কিন্তু স্ত্রীকে এইভাবে রাত দুটোর সময় চোরের মত চুপিচুপি নিঃসাড়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি কপট নিদ্রায় মটকা মেরে চোখ বুজে পড়েছিলেন। আধবোজা চোখে তিনি স্ত্রীর সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। এক সময়ে দেখলেন স্ত্রী আস্তে আস্তে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

টলস্টয় এতদিন সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করছিলেন কিন্তু এবারে সহ্যের বাঁধ ভাঙল। স্ত্রীর ওই গোপনতা প্রয়াসী আচরণ তাঁর বুকে শেল হানল। তিনি যদি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি বিলোনোই স্থির করে থাকবেন, সে কথা কি তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের আগেভাগে জানাতেন না? স্ত্রীকে লুকিয়ে তিনি উইলের ভাষা বদল করবেন এমন সন্দেহ স্ত্রীর মনে দেখা দিতে পারল কী করে? বিবাহিত জীবনে এযাবৎ তিনি স্ত্রীর কাছে কিছুই লুকোননি অথচ এই ব্যাপারে

স্ত্রী তাঁকে বিশ্বাস করতে পারলেন না এতটা নীচ সোফিয়া তাঁকে ভাবতে পারলেন ?

না, আর নয়। অনেক সহ্য করা গেছে, অশান্তিরও একটা সীমা আছে। টলস্টয় তখুনি মনস্থির করে ফেললেন, এই গৃহে আর তিনি বাস করবেন না—এই রাত্রির মধ্যেই গৃহত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। কোথায় যাবেন জানেন না, শুধু এই মাত্র জানেন অশান্তিময় গৃহে আর তিলার্ধকাল অবস্থিতি নয়।. এ গৃহের আবহাওয়া তাঁর কাছে বিষের মত বোধ হচ্ছে, যেখানেই যান পাপপুরীর বিষ-নিঃশ্বাস থেকে হাঁফ ছেড়ে তো অন্ততঃ বাঁচবেন।

সংকল্পমাত্রে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। অনির্দেশ যাত্রা, অনুদ্দেশ্য যাত্রার অন্য কোন লক্ষ্য নেই, শুধু এই ভবনের শ্বাস-রোধকারী আবহ থেকে মুক্তি পাবার কামনা ছাড়া। কাকপক্ষীতেও যাতে টের না পায় তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করলেন, তবে বিরাশি বছরের বৃদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় গৃহত্যাগ অসম্ভব, তাই দুজন বিশ্বস্তের সাহায্য নিলেন। প্রথম বিশ্বস্ত অনুগতা কন্যা আলেকজান্দ্রা, যাঁর সহানুভূতি গোড়া থেকেই পিতার দিকে ছিল, যিনি মায়ের বা অন্যান্য ভাইবোনদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেননি। সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রশ্নে মহাত্মা পিতার মহৎ অভিপ্রায়ে বাধাদান করাটাকে তিনি অন্যায় বলে জেনেছিলেন, তাই একক হয়েও তিনি গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন পিতার সপক্ষে। অন্য জন ইয়াসনায়া পলিয়ানার দীর্ঘদিনের গৃহচিকিৎসক। তিনি টলস্টয়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন।

যাত্রার লগ্ন অস্বাভাবিক, ততোধিক অস্বাভাবিক গৃহের পরিস্থিতি। এই অবস্থায় পিতাকে এইভাবে অজানা কোথাও একা ছেড়ে দিতে আলেকজান্দ্রার মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। পিতাকে সে কথা কন্যা মুখ ফুটে বলেও ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের অনমনীয় সংকল্পের তেজের সামনে কন্যার আপত্তি টেকেনি। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় অগত্যা তাঁকে যাত্রার আয়োজনে সায় দিতে হয়েছে। আলেকজান্দ্রা পিতার বেশবাস, বাক্সপত্র এবং যাত্রার উপযোগী অন্যান্য টুকিটাকি সাজসরঞ্জামাদি ঠিকঠাক করে দিলেন। আরেকজন এই গোপন যাত্রার নিরুপায় সাক্ষী ছিল। বিশ্বস্ত কোচোয়ান—মনিবের দীর্ঘদিনের গাড়ীর চালক, এই গৃহের এবং তার প্রভুর বহু সুখ-দুঃখের সাক্ষী। কোচোয়ানেরও প্রবল আপত্তি ছিল মনিবের এই নিশীথকালীন নিঃসঙ্গ যাত্রার সম্পর্কে। নভেম্বরের শেষ রাত্রি, বাইরে প্রচণ্ড হিম আর তুষারপাত হচ্ছে। এমন রাত্রে কি কেউ ঘরের বাইরে বেরয় ?

তার উপর এমন জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে কি কোথাও একা যেতে দিতে আছে? কিন্তু বৃদ্ধ নাছোড়। তাছাড়া প্রভুর জেদের কাছে ভৃত্যের আপত্তি কি কখনও টেকে? তবে আর ভৃত্যকে পরাধীন বলে কেন? কারুর কোন ওজরই টিকলো না তাঁর অদম্য জেদের কাছে।

অতি নিঃশব্দে ও সকলের অগোচরে টলস্টয় ভোর রাত্রে গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের অভিমুখে। পিছনে পড়ে রইল চিরপরিচিত গৃহ, দীর্ঘ ষাট বছরের বেশী যেখানে তিনি কাটিয়েছেন আপন নিকটাত্মীয়দের ভিতরে, তাঁদের নিয়ে। বহু অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টির সাক্ষ্যবাহী ঐতিহাসিক ইয়াসনায়া পলিয়ানা ভবন, যার প্রতিটি রেণুতে মিশে আছে তাঁর পদপাতের স্মৃতি।

যাবার আগে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ছোট একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন: "আমার খোঁজ করো না, আমি ফিরব না।" পরদিন সেই চিঠি পেয়ে সোফিয়া পাগলের মত হয়ে গেলেন। দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন বাগানের পুকুরে। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে জল থেকে টেনে তোলা হলো। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে আপন কৃত ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে ও বার বার স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে স্বামীকে এক চিঠি লিখলেন—"লেভোচকা, প্রিয় আমার, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বাড়ি ফিরে এসো। আর আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব না, তুমি যা চাও তাই করব। আমার বিলাসিতা আমি ত্যাগ করব, তোমার বন্ধুদের আপন বন্ধু বলে গ্রহণ করব। আমার ব্যবহারে তুমি আর খুঁত ধরার অবকাশ পাবে না। আমি হবো শান্ত, ধীর, মধুরস্বভাব; শুধু মিনতি আমার, একটি বারের জন্য ঘরে ফিরে এসো। আমাকে শোধরাবার সুযোগ দাও, আমাকে বাঁচাও।"

কিন্তু হায়, ততদিনে বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। পত্নীর সেই আকুল আহ্বান স্বামীর কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি। ইতোমধ্যে শেষ নভেম্বরের দুরন্ত হিমে টলস্টয় পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গন্তব্যহীন রেলভ্রমণে যখন আস্তাপোভা নামক এক অখ্যাত মধ্যবর্তী স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন তখন তিনি দুরন্ত নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত। গায়ে প্রবল জ্বর, চেতনা নিঃসাড়।

ধরাধরি করে তাঁকে গাড়ী থেকে নামানো হলো। এই অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায় আর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে, স্টেশন মাস্টারের অফিস কামরায় তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো। স্ত্রীপুত্রকন্যা আর নিকট বন্ধুদের খবর পাঠানো হলো। তাঁরা এসে উপস্থিত। ততদিনে সমস্ত রাশিয়ায় খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। বিশ্বজোড়া যাঁর খ্যাতি তিনি আত্মগোপন করে

থাকতে চাইলেও কি তাঁর পরিচয় গোপন থাকে? দলে দলে লোক আস্তাপোভা স্টেশনের অভিমুখে ছুটল।

স্ত্রীর অবস্থাই সবচেয়ে অসহায়। ডাক্তাররা সোফিয়াকে তাঁর স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে যেতে দিলেন না। তিনি কত কাকুতি-মিনতি করলেন, ডাক্তারের পায়ে মাথা খুঁড়লেন। কিন্তু তাঁরা নির্বিকার। পাছে স্ত্রীকে দেখে স্বামীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায় সেই ভয়ে তাঁরা ঝুঁকি নিতে চাননি। শেষে অবশ্য একবারটির জন্য স্বামীর শয্যাপার্শ্বে যেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বামী তখন অজ্ঞান। দুইয়ের মধ্যে অস্ফুটেও কোন ভাব বিনিময় হতে পারেনি।

সুচিকিৎসার সকল রকম বন্দোবস্তই করা হয়েছিল। কিন্তু সব বৃথা। অনেক চেষ্টা করেও টলস্টয়কে বাঁচানো গেল না। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আট-নয়দিন বাদে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা এক অখ্যাত-অজ্ঞাত পল্লীতে নিতান্ত অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে প্রাণত্যাগ করলেন। অন্তিমের ঘটনাগুলি যেমনি শোকাবহ তেমনি করুণ। তারিখটা ছিল ১৯১০ সালের ২০শে নভেম্বর (নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী)।

ইয়াসনায়া পলিয়ানার গৃহসংলগ্ন বনস্থলীতে মহামতি টলস্টয়কে সমাধিস্থ করা হয়। আজও হাজার হাজার টলস্টয়-অনুরাগী দর্শনার্থী জনতা এই ঋষিপ্রতিম মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁর সমাধিভূমিতে সমবেত হন। তাঁর ভবন স্মৃতিসৌধে পরিণত। অমর শিল্পী ও মহান চিন্তানায়ক টলস্টয়ের দুনিয়াজোড়া প্রভাবের লয়-ক্ষয় নেই।

আত্মোন্নতির প্রয়াস

টলস্টয় যৌবনকালে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন একথা সুবিদিত। তিনি জুয়া খেলতে ভালবাসতেন, মদ্যপায়ী ছিলেন, এবং কামচর্চার ক্ষেত্রেও উদ্দাম প্রকৃতির বশ ছিলেন বলে জানা যায়। রুশ অভিজাত গৃহের এক বিত্তসচ্ছল সন্তানের পক্ষে ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা তৎকালের প্রচলিত রুশ সমাজের সংস্কার অনুযায়ী মোটেই দোষাবহ কোন ব্যাপার ছিল না। বরং এর ব্যত্যয় হলেই বুঝি সেই দৃষ্টান্ত কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়ার কারণ ছিল। কাউণ্ট উপাধির ধারক বনেদী টলস্টয় পরিবারের পূর্ব ইতিবৃত্ত যতটুকু জানা যায় তার থেকে দেখা যায় সমাজ অনুমোদিত স্বীকৃত সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহ-সম্বন্ধের বাইরে নারীসঙ্গ করাটা ওই পরিবারে মোটেই অনাচরণীয় কোন ব্যাপার ছিল না। ইয়াসনায়া পলিয়ানার কর্তা-জমিদার বা তাঁর পুত্রদের সার্ফ রমণী বা সার্ফবালাদের সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের একাধিক ঘটনার বৃত্তান্ত টলস্টয়ের জীবনী পড়তে পড়তেই অবগত হওয়া যায়। টলস্টয়ের পিতার জীবনে এমনতর ঘটনা ঘটেছিল: টলস্টয়ের সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীরা ছাড়াও তাঁর আরও দু-একটি অবৈধ সৎ ভাই বা ভগিনী ছিল। টলস্টয়ের এক ভাই সার্জি এক জিপসী যুবতীর সঙ্গে বেশ কিছুকাল স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করার পর অবশেষে তাকে বিবাহ করেন। টলস্টয়ের আর এক ভাই ডিমিট্রি এক বারবণিতার সঙ্গে কিছুদিন প্রণয়সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে কাল কাটিয়েছিলেন। টলস্টয়ের নিজের জীবনেও অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা একাধিক ছিল বলে জানা যায়। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর জীবনে নারী সাহচর্যের শুরু হয়। পরে ইয়াসনায়া পলিয়ানার জমিদারীতে ফিরে আসার পর এবং লেখক রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন তিনি মাঝে মধ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গে লেখকদের সান্নিধ্যে এসে বাস করতে থাকেন তখন তাঁর জীবনে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উদ্দামতার একটি বিশেষ অস্থির পর্ব অতিবাহিত হতে দেখা যায়। সেণ্ট পিটার্সবার্গে যখন অগ্রজ লেখকবন্ধু টুর্গেনিভের গৃহে বাস করতেন তখন প্রায়ই তাঁকে রাত্রিতে বাড়িতে পাওয়া যেত না। নৃত্যগীতরতা জিপসীবালাদের সঙ্গে সারারাত হৈ হল্লা করে কাটিয়ে ভোরের দিকে বাড়ি ফিরতেন এবং সারা সকাল অঘোরে ঘুমোতেন।

জুয়া খেলার অভ্যাস বৃদ্ধি পায় ককেশাসে সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে। তার

আনুষঙ্গিক হিসাবে শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের চর্চা। যদিও টলস্টয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বীরত্বের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তাহলেও বীর সৈনিকের খ্যাতির পাশে পাশেই ছিল উদ্দাম বন্য জীবন-যাপনের জন্য অখ্যাতি ও কুখ্যাতি। এখানে তিনি অপরিমিত নেশার মাশুল জোগাতে গিয়ে ও জুয়ায় হেরে কোনও কোনও সময় সাংঘাতিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং ঋণের দায় মেটাতে গিয়ে কখনও কখনও এমন পর্যন্ত হয়েছে যে, তাঁকে সম্পত্তি পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছে। এই রকমের এক ঋণমোচনের বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁর ইয়াসনায়া পলিয়ানার জমিদারীর এক ভাগ হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে অবশ্য পুনরুদ্ধার হয়।

টলস্টয়ের যৌবনকালের জীবনযাত্রার যে ছকটি উপরে তুলে ধরা হয়েছে তার থেকে তাঁর উপর নির্মম হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু মনুষ্যজীবন এত জটিল আর মানুষের যৌবনোদ্গম ও প্রাপ্ত যৌবনের অধ্যায় এত পিচ্ছিল ও পদে পদে আবর্ত-সঙ্কুল যে, নির্মম বিচারকের ভূমিকায় নিজেকে সমাসীন করে পরের দোষ ত্রুটি স্খলন-বিচ্যুতির উপর ক্ষমাহীন রায় জারী করতে আমরা না-ই বা চেষ্টা করলুম। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যসনাদির চর্চার মধ্যে চিত্তের যে ঝোঁক প্রকাশ পায় তাকে কেবলমাত্র নিছক যৌবনধর্মের লক্ষণ মনে করলে ভুল করা হবে—তার মূলে আরও গভীর, আরও তলাতিশায়ী বংশগত, পারিবারিক কিংবা পরিবেশগত কারণ নিহিত থাকে। টলস্টয় কাজানে থাকাকালীন নিজেই তাঁর ছাত্র বয়সের ডায়েরীতে এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, "সবচেয়ে জরুরী যে-ব্যাপার আমি আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি তা হলো, বেশীর ভাগ লোক যৌবনকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার জন্য দায়ী করে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়; অল্প বয়স থেকে স্বভাব মন্দ হলে তবেই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়।"

স্বভাব মন্দ হয় কি সাধে? টলস্টয়দের পারিবারিক ইতিহাস বিচার করেই দেখা যাক না কেন। ডাকসাইটে জমিদার গৃহের ছেলে বয়সকালে একটু 'ফুর্তি-ফার্তি' করবে, জুয়ার আর পানের নেশায় একটু-আধটু বেচাল হবে—এমনতর স্বাধীনতার অনুমোদন টলস্টয়দের গৃহের আবহাওয়ার মধ্যেই ছিল। খুব সম্ভব দেশী-বিদেশী পুরনো বনেদী ধনী গৃহমাত্রের আবহাওয়ার মধ্যেই এই জাতীয় আচরণের কিছু-কিঞ্চিৎ অনুমোদন থাকে। নইলে যে বনেদিয়ানার গৌরব থাকে না, ধনের কৌলিন্যের বাহ্বাস্ফোট করা যায় না। ঠিক যেমন উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের রক্ষিতা পোষণ. অথবা পালে-পার্বণে উৎসবে সমারোহে বাইজী নাচানো কিংবা বেবুশ্যে নিয়ে ঢলাঢলি করাটা তেমন নিন্দনীয় কোন ব্যাপার ছিল না। শুধু কি তাই? অবিশ্বাস্য হলেও একথা ষোল-আনা

সত্যি যে টলস্টয় পরিবারের লোকেরা মনে করতেন যে, কোন অবিবাহিত যুবকের যথার্থ সহবৎ ও শিষ্ট আচরণাদি শেখবার জন্য কিছুকাল অন্ততঃ কোন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকা উচিত। তাজ্জবের এখানেই শেষ নয়। টলস্টয়ের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিনী গুরুজন স্থানীয়া আত্মীয়া মাতৃস্বসা তাতিয়ানা আলেকজান্দ্রোভনা, যাঁর কাছে টলস্টয়ের ঋণ অশেষ, স্বয়ং অত্যন্ত স্নেহশীলা পূতচরিত্রা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, বোনপোটির রুচির পরিশীলনের জন্য ও কমনীয় আচার-আচরণ শিক্ষার জন্য তার কিছুকাল একজন সঙ্গিনীর সঙ্গে বাস করা দরকার এবং সেই সঙ্গিনীটি একজন বিবাহিতা নারী হলে আরও ভাল। বলা দরকার, তাতিয়ানা যখন তাঁর বোনপোর সম্পর্কে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখনও টলস্টয়ের সোফিয়া বারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনেক বিলম্ব। এটা টলস্টয়ের ছাত্র বয়সের সময়কার কথা। তাতিয়ানা তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ ভগিনীপুত্রের মঙ্গলের জন্যই সহজ বিশ্বাসে এই প্রস্তাব করেছিলেন—এর মধ্যে কূটচিন্তা বা আবিল মনোভাবের কোন স্থান ছিল না। (তুলনীয় 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে ভ্রনস্কির মায়ের ভ্রনস্কির সম্পর্কে একই রূপ ইচ্ছার প্রকাশ।)

কিন্তু যেখানে বংশের ঐতিহ্য আর পারিবারিক ধ্যান-ধারণার মধ্যেই এমনতর মনোভঙ্গীর পোষকতা থাকে, সেখানে টলস্টয় যৌবনে কিছুটা নিরয়গামী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। বরং তিনি যে আরও বিগড়ে যাননি সেইটাই এক এক সময় অতীব বিস্ময়কর মনে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতার রাস্তায় চলতে চলতে অধঃপতনের চূড়ান্ত পারঘাটায় মুখ থুবড়ে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পথে টলস্টয়কে বাধা দেবার কেউ ছিল না কিছু ছিল না—না পারিবারিক বাধা, না সামাজিক বাধা, না অন্য কোন বাধা। অবলীলাক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়ার মত মসৃণ রাস্তা তাঁর সামনে অবারিত খোলা ছিল। অথচ আশ্চর্য, টলস্টয় নিজেকে ধ্বংস হতে দেননি। কী এক বিস্ময়কর আভ্যন্তর শক্তি প্রভাবে তিনি মাঝ-পথে নিজেকে নিজে টেনে ধরেছিলেন এবং অসংযমের পথ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সচেতন আত্মোন্নতির প্রচেষ্টার অভিমুখে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রবৃত্তির স্রোতে রাশ আলগা দিয়ে তাঁর সত্তার এক অংশ যখন উদ্দামতার ঢেউয়ে মাতামাতি করতে উন্মুখ, একই কালে তাঁর সত্তার অপর এক অংশ তখন তাঁকে সর্বনাশা পথ থেকে সরে আসার জন্য তাঁর কানে মন্ত্র গুঞ্জরণে ব্যস্ত। উপনিষদোক্ত দুই পাখীর মত তাঁর ব্যক্তিত্বের এক ভাগে আকর্ষণ, অন্য ভাগে নির্বেদ। একটি পাখী যখন

সংসারের পাঁক নিজের গায়ে মাখছে, অন্য পাখী তখন তার সেই কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছে। টলস্টয় চরিত্রের এই যে দিক—সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক—তা-ই তাঁকে সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা করেছে এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কালক্রমে তিনি যে কেবলমাত্র রুশ দেশের নয় সমগ্র বিশ্বের এক সেরা মানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তারও মূলে আছে তাঁর এই সদাজাগ্রত বিচারপরায়ণতার অভ্যাস। আবার এই বিচারপরায়ণতাই তাঁকে নিছক শিল্পী হিসাবে পরিতৃপ্ত থাকবার ভাগ্য মেনে নিতে দেয়নি, তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও ঋষিকল্প মানুষে পরিবর্তিত করেছিল।

ক্রমাগত আত্মসমীক্ষা, আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে লখক টেলস্টয়ের গোত্রবদল হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসে শিল্প ও মানবতার এত বড় সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আধুনিক কালের পটভূমিকায় এমন আর একটিও দেখানো যাবে কিনা সন্দেহ। যিনি চূড়ান্ত ভোগ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি চূড়ান্ত ত্যাগে এসে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। ভোগ থেকে ত্যাগে এই ক্রমিক উত্তরণের মূলে ছিল তাঁর দুর্মর বিবেক, সংকল্পের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যায়াম থেকে আপনাকে এক মুহূর্তও বিশ্রাম না দেওয়া।

তিনি বরাবর প্রতিজ্ঞার আবেশের মধ্যে বাস করতেন। অর্থাৎ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতন স্বভাবের মন্দ ঝোঁক ইত্যাদি কিসে দূর করা যায়, কিসে স্বভাব-দোষের সংশোধন করে নিজেকে ভালর দিকে নিয়ে যাওয়া যায়—অষ্টক্ষণ এই নিয়ে তাঁর এক তিলের জন্যও অধ্যবসায়ের বিরাম ছিল না। মন্দত্ব পরিহার ও ভাল হবার তাগিদে তিনি আপনাকে এক পলকের জন্য স্বস্তিতে থাকবার অবকাশ দিতেন না। জাগ্রত অবস্থায় সর্বক্ষণ তিনি আত্মোন্নয়নের দুশ্চর তপস্যায় রত থাকতেন। প্রতিজ্ঞা করছেন, প্রতিজ্ঞা ভাঙছেন, আবার নতুন প্রতিজ্ঞা করছেন—এইভাবে একটার পর একটা প্রতিজ্ঞার জালিতে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নিত্যকৃত্যের ছকটি গাঁথা ছিল। রোজকার দিন তো নয়—সংকল্পের পর সংকল্পে বোনা সে এক নক্সী কাঁথার মাঠ। একজন সমালোচক টলস্টয়ের জীবনের এই দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, স্বীয় জীবনকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলতে যুবক টলস্টয়ের পারঙ্গমতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। এ কথা অতি যথার্থ। অনবরত সংকল্পের মধ্যে থেকে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে অযথা জটিল করে তুলেছিলেন। প্রতিজ্ঞা ভাঙা আর প্রতিজ্ঞা গড়া—এরই টানাপোড়েনের অন্তহীন ইতিবৃত্তে ভরা তাঁর প্রাত্যহিক দিনের কাহিনী।

টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা আর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতা বিশুদ্ধ জ্ঞানের তৃষ্ণা তাঁর স্বভাবে পাশাপাশি বিধৃত ছিল। পাশাপাশি এই দুই পরস্পরবিরোধী বৃত্তির অবস্থান যদি মানবীয় স্বভাবে অসম্ভব হয় তাহলে বলতেই হয় একান্তরক্রমে এই দুই বৃত্তির আসা-যাওয়া চলতো তাঁর স্বভাবে। অর্থাৎ একটির পর আর একটি—এই ক্রম অনুসারে তাঁর জীবনে এই খেলা চলতো। আলো-অন্ধকারের খেলা, জোয়ার-ভাঁটার খেলা। কখনও তাঁর আচরণ মহান্ সংকল্পের পবিত্রতায় অতিশয় ঊর্ধ্বমুখী, কখনও তা প্রবৃত্তির মলিনতায় অতিশয় নিম্নাভিমুখী। এই ভাবছেন এখন থেকে অত্যন্ত সংযতচিত্ত হয়ে কেবলমাত্র লেখাপড়া নিয়েই কাল কাটাবেন, আর কখনও খারাপ দিকে যাবেন না ; পরে আর এক মেজাজ-ফেরতার কালে তিনিই আবার ভাবছেন আত্মোন্নয়ন এখন মুলতুবী থাক, বেশ একটু চুটিয়ে আমোদ-স্ফূর্তি করে নেওয়া যাক। এই তাঁর মনে হলো সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে তখন জুয়ার টেবিলে বসে বেশ কয়েক রাউণ্ড জুয়ো খেলে নেওয়া যাক কিংবা জিপসী স্বৈরিণীর সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে পানাতিশয্যে রাত্রি কাটানো যাক, কিন্তু নেশা ভাঙতেই তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তখন যাকে বলে খোঁয়াড়ি ভাঙা তার অবসাদ তাঁকে গ্রাস করতো না, পুরাপুরি ভিন্ন এক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে তিনি তখুনি নতুন করে আবার আত্মোন্নতির চেষ্টায় লেগে যেতেন। গত রাত্রিতে যে দেহ মনের উপর দিয়ে একটা ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তার আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতো না তাঁর নবোজ্জীবিত চরিত্র গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে। গত রাত্রির ক্লেদাক্ত স্মৃতিই হয়ত আর তাঁর মনে থাকত না।

এ এক অদ্ভুত স্বভাব। প্রাণশক্তির এক আশ্চর্য লীলা ওই স্বভাবে প্রকাশমান। হাঁসের পাখায় যেমন জল জমতে পায় না, তেমনি তাঁর স্বভাবগত চরিত্রের পাখায়ও যেন মলিন আচার-আচরণের জল জমতে পেত না। জল জমবার উপক্রম হতেই তিনি সচেতন চেষ্টায় সেই জল ঝেড়ে ফেলতেন। যে ব্যক্তি নিশাযোগে স্থূল আমোদ-প্রমোদের হদ্দ করে ছেড়েছেন আর যে ব্যক্তি দিনের বেলা ঘুম থেকে উঠেই আত্মসংশোধনের জন্য লিখিত আকারে প্রতিজ্ঞা পত্রের ছক তৈরী করছেন—কে বলবে একই ব্যক্তির ওই দুই কাজ ? প্রতিজ্ঞাপত্রে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, সদর্থক এবং নিষেধাত্মক (ডু'স অ্যাণ্ড ডোণ্টস) এই দুই ধরনের সংকল্পেরই অভিব্যক্তি থাকত। হামেসাই টলস্টয় এই জাতীয় অনুশীলনীতে নিরত থাকতেন।

প্রতিজ্ঞা-পত্রের দুই-চারটি নমুনা নীচে তুলে ধরছি। তার থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন টলস্টয় মানুষটি কী ধাতুতে গড়া ছিলেন। উনি যে সাধারণ মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের এক ব্যক্তি এবং প্রতিভাধরদের একজন—নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই তার পরিচয় ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমে কাছে ভিতের লোকেরা তাঁর এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য টের পেতে শুরু করেছিলেন, পরে বৃহত্তর জনসমাজে ওই পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে।

টলস্টয় যখন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর উপর একটি বিশেষ রচনা তৈরী করার ভার পড়েছিল। কাজটি কঠিন, কিন্তু কাজের দুরূহতায় দমিত না হয়ে তিনি কাজটিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। কাজটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য তিনি আপনার সুবিধার্থে একটি ছয়-দফা নিয়মবিধি প্রণয়ন করে সেটা সর্বদা তাঁর চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখতেন। নিয়মবিধিটি এইরূপ :

"১. নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোন কাজ করার থাকলে তা অবশ্য সম্পাদন করতে হবে। ২. যা-ই তুমি কর না কেন, ভালভাবে কর। ৩. যে জিনিস ভুলে গিয়েছ তার জন্য অনুশোচনা করো না, তবে ভুলে যাওয়া জিনিসটা কী ছিল তা মনে করার চেষ্টা করো। ৪. সমস্তক্ষণ মনকে সক্রিয় রাখ এবং সাধ্যানুযায়ী কাজ কর। ৫. সর্বদা উচ্চারণ করে পড়বে ও লিখবে। ৬. যে সব লোক তোমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের সে কথা বলতে দ্বিধা করবে না; প্রথমে তোমার মনোভাবের একটা আভাস দেবে, তাতে যদি কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে তাদের জানিয়ে দেবে তারা তোমার কাজের ক্ষতি করছে।"

টলস্টয় যখন সৈনিকবৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বক্ষণের লেখক হবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন তখন তাঁর রুটিনেরও বদল হয়েছে। তিনি সাহিত্যকর্মের সদা-উজ্জীবকরূপে এই স্মারক-বাক্যটি সর্বদা টেবিলের উপর রেখে তদনুযায়ী চলবার চেষ্টা করতেন :

"আমার সাহিত্যসম্বন্ধীয় নিত্যকর্তব্য হলো—অনুশীলন, ক্রমাগত অনুশীলন, অন্তহীন অনুশীলন।" এটা ১৮৫২ সালের কথা। সেই সময় তিনি নিজের জন্য আরও তিনদফা নিয়ম সর্বদা চোখের সামনে বিন্যস্ত রাখতেন। নিয়ম তৈরীর দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। এই নিয়মত্রয়ী হলো :

১. আমি যা, আমাকে তা-ই হতে হবে।

২. আমাকে শক্তিশালী লেখক হতে হবে।

৩. জন্ম-অভিজাতের মত যেন আমার চালচলন হয়।

শেষের সংকল্পটিতে আভিজাত্যের প্রতি মোহ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার টলস্টয়-চরিত্রের বিবর্তনের তখন সবে সূচনাকাল। ক্রমাগত ঊর্ধায়নের মধ্য দিয়ে কালক্রমে তিনি আভিজাত্যের সকল সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসবার সজ্ঞান সাধনা করেছিলেন। বনেদিয়ানার অহংকারে জলাঞ্জলি দিয়ে একজন খেটে-খাওয়া ম্যুঝিকের মত তাঁর নিজে হাতে চাষবাস করবার চেষ্টা এবং নিজের হাতে জুতো সেলাই মনে করিয়ে দেয় শ্রেণী-কৌলীন্যের ধাপ থেকে অবতরণ (অথবা আরোহণ ?) করতে করতে কোথায় গিয়ে তিনি পৌছেছিলেন। এ যদি শ্রেণীহীন (ডিক্লাশড) হওয়ার সাধনা না হয় তো কাকে শ্রেণীহীন হওয়ার সাধনা বলে জানি না।

যাই হোক, তাঁর আত্মোন্নতি প্রয়াসের কথা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। টলস্টয় ছাত্র বয়সেই রুশোর যাবতীয় রচনা (কুড়ি ভল্যুম) পড়ে শেষ করেছিলেন। এমন কি তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী পর্যন্ত। রুশোর তিনি অতিশয় ভক্ত ছিলেন। রুশোর বিপ্লবী শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জমিদারীতে প্রজাদের মধ্যে রুশোর ধ্যান-ধারণার অনুসরণে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন। একটা সময়ে রুশোর প্রতি তাঁর অনুরাগ এত বৃদ্ধি পায় যে, গলায় লকেট পরে তাতে রুশোর মিনিয়েচার ছবি ঝুলিয়ে রাখতেন। শুধু তাই নয়, যেহেতু রুশো ফরাসী বিপ্লবের ভাবনায়কদের অন্যতম ছিলেন স্থতরাং তাঁরও মনে হয়েছিল রাশিয়ায়ও বিপ্লব সাধনের জন্য তিনি উদ্দিষ্ট এবং সেই ভাবে তিনি সর্বদা ভাবিত থাকবার চেষ্টা করতেন। বিপ্লবীদের নাকি মামুলী পোশাক পরলে চলে না, তাই তিনি একটি লম্বা আলখাল্লা বানিয়ে তার খোলের ভিতর আপাদমস্তক সেঁধিয়ে চলে ফিরে বেড়াতেন। অনেকটা আমাদের দেশের বাউল দরবেশের মত পরিচ্ছদ আর কি। বিপ্লবীর পক্ষে এমন পোশাক মানাবে না তো আর কী মানাবে ?

পড়াশুনায় অদম্য উৎসাহ ছিল। এমন বড় একটা সচরাচর দেখা যায় না। তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করতেন, যখন অধ্যয়ন করতেন তখন বাহ্যজ্ঞান থাকত না, শুরুতেই বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতেন। এ প্রকৃতির এক পরম আশীর্বাদ, যা টলস্টয়ের শিরোপরি অঝোর ধারে বর্ষিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি যে প্রবৃত্তির তাড়নায় ভুগতেন সেই পশ্চাৎটান তাঁর এই সহজাত পাঠস্পৃহার ধারকে এতটুকু ক্ষয় বা মলিন করতে পারেনি। তাঁর পাঠস্পৃহার তীব্রতা সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট যে তিনি যখন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন তখন এক ছুটিতে বাড়িতে ফিরে এসে মণ্টেস্কু ও রুশো পড়েন। মণ্টেস্কু আর রুশোর

সাহিত্য পাঠে এমন ডুবে যান যে তাঁর মনের চোখের সামনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন-বাঁধা পড়ায় আর তিনি রস খুঁজে পেলেন না এবং তক্ষুনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সংকল্প করলেন। স্বাধীন পাঠের ক্ষুধা মেটাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা—এমন নজির সহসা দেখানো যাবে কি? এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে টলস্টয়ের নিজের কথা উদ্ধৃত করছি:

"ছুটো কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছাড়ি। এক, আমার দাদা পড়া সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় কারণ, কারণটি যদিও অদ্ভুত শোনাবে তবুও বলছি, গুরুভার রচনাটির ('ক্যাথারিনস ইনস্ট্রাকশন') উপর কাজ করতে গিয়ে আমার সামনে স্বাধীন মননবৃত্তির নূতন এক ক্ষেত্র অবারিত হলো। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার ধরনটা গতানুগতিক, তা আমার স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির বিকাশে মোটেই সহায়তা করেনি বরং বাধারই সৃষ্টি করছিল।"

কী অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোর আর স্বাধীনতার স্পৃহা। নিজের খেয়ালখুশী মত পড়ার জন্য কী আকুলতা! পড়ার তন্ময়তাই বা কত গভীর। একবার জমিদারীর চাষ-আবাদের কাজের প্রয়োজনে দূরের এক খামার বাড়িতে এক রাত্রি কাটাতে হয়েছিল। ঘুমুতে যাওয়ার আগে হাতের কাছে একটি বই পেলেন—একখানি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থকারের নামের উপর চোখ না বুলিয়েই পড়ার আকর্ষণে পড়ার মধ্যে ডুবে গেলেন। একবার পড়লেন, ছুবার পড়লেন, তন্ন তন্ন করে বইটির এ মলাট থেকে ওই মলাট পর্যন্ত উল্টালেন পাল্টালেন। সেই রাত্রে আর ঘুম হলো না। বইখানি কী? না, পুশকিনের ইভজেনি ওনেগিন। এম্নি ছিল তাঁর গ্রন্থপাঠের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং পাঠ্যবস্তুর অনুধাবনে শরবৎ তন্ময়তা।

সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি হিসাবে টলস্টয় কী কী বিষয় পড়তে হবে তার একটি 'ছক' তৈরী করেছিলেন। আর সেটিকে সর্বদা চোখের সামনে টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন। টানা ছু-বছর তিনি এই নিয়ম অনুযায়ী চলেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হলে তালিকায় যোগ-বিয়োগ করতেন। ইংরেজী, লাটিন এবং রুশ ব্যাকরণ শিক্ষা করা ছাড়াও তিনি তালিকায় যে সব পঠনীয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তার চেহারা এইরূপ:

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেতে হলে যে-আইনের জ্ঞান দরকার তার গোটা পাঠক্রম আয়ত্ত করা। ২. ব্যবহারিক ভেষজ বিদ্যা পূর্ণতঃ এবং তাত্ত্বিক ভেষজবিদ্যার কিছু অংশ অধ্যয়ন করা। ৩. ফরাসী, রুশ, জার্মান, ইংরেজী,

ইতালীয় ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করা। ৪. ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক উভয়বিধ কৃষিবিজ্ঞান আয়ত্ত করা। ৫. ইতিহাস, ভূগোল ও পরিসংখ্যান বিদ্যা শেখা। ৬. গণিত অধ্যয়ন এবং বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যাকরণ আয়ত্তকরণ। ৭. একটি গবেষণা-পত্র (থীসিস) প্রণয়ন। ৮. সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মোটামুটি কুশলতা অর্জন। ৯. একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মবিধি প্রণয়ন। ১০. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে কিছু পরিমাণ জ্ঞান অর্জন। ১১. অধীত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরেই প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখবার জন্য প্রযত্ন করা।

এই কার্যসূচীর অধিকাংশই টলস্টয় সংকল্প অনুযায়ী কাজে পরিণত করেছিলেন। বিশেষ করে সঙ্গীত, ইংরেজী ভাষা, কৃষিতত্ত্ব শিক্ষায় তাঁর অভিনিবেশের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এদের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানটাই ছিল সবচেয়ে দুরূহ বিষয়।

টলস্টয়ের এই দু-বছর-মেয়াদী পাঠ্যসূচী চকিতে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের আর একজন প্রতিভাবানের কথা। তিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি রোজকার পাঠ্য রুটিন হিসাবে দৈনিক দু-ঘণ্টা গ্রীক দু-ঘণ্টা লাটিন দু-ঘণ্টা হিব্রু দু-ঘণ্টা সংস্কৃত এই ভাবে পরের পর পাঠ্য নির্দেশ করে তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যের তালিকা রচনা করেছিলেন। উভয়েরই এই পাঠ্যসূচী প্রণয়নের মূলে আছে দুর্দমনীয় আত্মোন্নতির প্রয়াস। মজ্জাগত পাঠস্পৃহা অবশ্যই ছিল কিন্তু শুধুমাত্র পাঠস্পৃহার তথ্যের দ্বারা ও জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না। এর মূলে আছে প্রবলতম উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা। অবশ্য 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' কথাটাকে এখানে তার উত্তম অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, কদর্থে নয়।

টলস্টয় শুধু যে নিজের জন্য পাঠ্যসূচীই ছকেছিলেন তা-ই নয়, কীভাবে সমাজে মিশতে হবে, মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কেমনভাবে অভিজাত গৃহের বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে হবে, বই পড়তে হবে কী ধারায় — ঐ সব বিষয়েও তিনি 'নিয়ম' তৈরী করেছিলেন। মোট কথা, 'নিয়ম' বানানোর প্রতি তাঁর এক মজ্জাগত ঝোঁক ছিল। আর ঝোঁক ছিল ডায়েরীতে প্রতিটি স্খলন-পতনের কথা লিখে রাখার। কৃত পাপাচরণের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা আর পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ নিজেকে নিজে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য বিবেকী মানুষের দেখা মেলা দুষ্কর। এই ক্রমাগত আত্মসংশোধনের চেষ্টাই তাঁর স্বভাবকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বায়িত করেছিল এবং পরিণামে তাঁর ব্যক্তিত্বের গোত্রবদল ঘটিয়েছিল। টলস্টয়ের ডায়েরী তো ডায়েরী নয়, ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে তার যে স্ব-স্বরূপ, তার মুখোমুখি হওয়ার দর্পণ।

পরিশেষে, টলস্টয়ের এই বিরামহীন আত্মোন্নতির প্রয়াসকে তাঁর জীবনীকার প্রখ্যাত রুশ লেখক Victor Shklovsky কী চোখে দেখেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি :

"টলস্টয় এমন এক যুবক, যিনি স্ত্রীলোকদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছেন, যাঁর নিজের উপর আদৌ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না, যিনি ছিলেন দাম্ভিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাসের জুয়ায় আসক্ত এক সবিশেষ প্রতিভাধর তরুণ, তিনি আপনাকে একজন স্কুলশিক্ষকের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত করেছিলেন। স্বীয় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর স্বভাবকে এমনভাবে গড়ে পিঠে তুলে-ছিলেন যেন সেটি একটি ময়দার তাল। এইভাবে প্রচণ্ড বাধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তিনি নিজেকে ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন।"

লৌহকঠিন ইচ্ছার দৃঢ়তাই হলো আসল কথা। ইচ্ছাশক্তি দুর্বার হলে তার দ্বারা পর্বত টলানো যায়, টলস্টয়ের জীবনই তার প্রমাণ।

সাহিত্য

টলস্টয়ের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ছোটবেলা থেকে ডায়েরী রাখার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে। ডায়েরীগুলিও আবার নিছক দৈনন্দিন কৃত্যের মামুলী রোজনামচা নয়—আত্মসমালোচনার আয়নায় স্বীয় প্রতিবিম্বের বিশ্লেষণ। নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটী-বিচ্যুতির অকপট স্বীকৃতি এবং তজ্জন্য আন্তরিক অনুশোচনা টলস্টয়ের দিনলিপিকে এক বিরল মহিমায় ভূষিত করেছে। একটি বালকের পক্ষে আত্মসমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে সংশোধন করার অবিরত চেষ্টা এমনই এক দুর্লভ ঘটনা যে, ওই সংবাদ থেকেই মানুষটির অসাধারণত্ব বোঝা যায়। যে বয়সে লোকের মন বহির্মুখ থাকে অর্থাৎ বহিরঙ্গ ঘটনাবলীর দিকেই উৎসাহ বেশীর ভাগ সময় থাকে নিবদ্ধ, আত্মসমালোচনা তো পরের কথা, আত্মচেতনারই যখন উন্মেষ হয় না, উন্মেষ হলেও তা থাকে নিতান্ত অস্ফুট, সেই শৈশবাবস্থাতেই কিনা টলস্টয় আপনার স্বভাবকে চিড়েফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে তার দোষত্রুটী-গুলিকে খুঁটিয়ে (খুঁচিয়েও বলা যায়) বার করেছেন এবং সেগুলির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করছেন—এ জিনিস এমনই এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার যা প্রথম দর্শনে বিশ্বাস করতে বাধে। অথচ টলস্টয়ের বাল্য বৃত্তান্তের এইটিই হলো মূল বৈশিষ্ট্য। টলস্টয়ের এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে কেবলমাত্র শিল্পীর স্তরে আবদ্ধ না রেখে তাঁকে এক বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষে রূপান্তরিত করেছিল—তিনি এক ঋষিকল্প ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

নিতান্ত ছোটবেলাতেই মনের মুখোমুখী হওয়ার অভ্যাস টলস্টয়কে এক কথায় যাকে বলে অন্তর্মুখ (ইনট্রোভার্ট) ভাবযুক্ত ঘরকুনো গোছের বালকে পরিণত করতে পারতো। কিন্তু এখানেই টলস্টয় চরিত্রের বিশেষত্ব যে, তিনি মোটেই ঘরকুনো স্বভাবের ছিলেন না। অন্যান্য দশটি সুস্থ বহির্মুখ (এক্সট্রোভার্ট) স্বভাবের বালকের মত তিনি খেলাধুলা ভালবাসতেন, দৌড়ঝাঁপ ভালবাসতেন, আমোদ-প্রমোদ ভালবাসতেন। এবং যৌবনে তাঁর বিশেষ সামাজিক অবস্থার সুযোগের দৌলতে অশ্বারোহণে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, মাঝে মাঝে শিকারে বেরতেন, আর জুয়া খেলার নেশায় মেতে উঠেছিলেন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক নেশার কথা আর নাই বা বললাম। তার মানে এই যে, অন্তর্মুখ আর বহির্মুখ এই দুই ধরনের বৃত্তির দিকেই ছিল তাঁর চিত্তের সমান ঝোঁক। এটি এমন একটি যোগাযোগ যা সচরাচর লোকের মধ্যে দেখা যায় না, আর তাতেই টলস্টয় চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল নানা দিক দিয়ে।

দিনলিপিতে টলস্টয় যে জাতীয় আত্মসমীক্ষণ করতেন তা নিজের প্রতি ছিল সম্পূর্ণ ক্ষমাহীন ও নির্মম। পারিপার্শ্বিকের অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হতো না কিন্তু সবচেয়ে অপছন্দ হতো তাঁর নিজের চোখেই নিজের আচরণ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ চতুষ্টয় 'রেমিনিসেন্সেস অব চাইল্ডহুড' অথবা সংক্ষেপে 'চাইল্ডহুড' (১৮৫২), 'বয়হুড' (১৮৫৩-৫৪), 'ইয়ুথ' (১৮৫৬) এবং সবশেষে অনেক দিন পরের লেখা 'মাই কনফেশন' (১৮৭৯) প্রত্যেকটিই এই প্রকার কঠোর আত্মসমালোচনায় ভরপুর।

টলস্টয়ের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব চাইল্ডহুড-এর মত আত্মজৈবনিক গ্রন্থ দিয়ে এটিও বিশেষ লক্ষ্য করবার মত একটি ঘটনা। উপন্যাস নয় ছোটগল্প নয় নাটক নয় কাব্য নয় ভ্রমণ কাহিনী নয় রম্যরচনা নয়, প্রথমেই লিখতে গেলেন কিনা একটি আত্মজীবনীর মিশেল দেওয়া বহুলাংশে সত্যভিত্তিক কিছুটা কাল্পনিক এক আত্মজীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী। তাও শৈশবের কাহিনী, কৈশোর বা যৌবনের ঘটনাবলীর কাহিনী নয়। এই থেকেই টলস্টয়ের মানসিক ধাত এবং সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় মেলে।

ককেশাসে সৈন্য বিভাগে থাকাকালে এটি রচিত হয় এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গের সাহিত্য পত্রিকা 'দি কনটেম্পোরারী'তে প্রকাশার্থ পাঠান হয়। রচনাটি যদিও আত্মজীবনীর অংশ তাহলেও উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা বলে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল পাঠকের এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সাহিত্যসমাজ বইটিকে লুফে নেয়। টলস্টয়ের খ্যাতি রাতারাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কনটেম্পোরারী পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক নেক্রাসভ রুশ সাহিত্য-গগনে এক নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছে বলে নবীন লেখককে অভিনন্দিত করলেন। তাঁকে রুশ গ্রন্থকার জগতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েই শুধু তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর পত্রিকার জন্য নতুন নতুন লেখার ফরমায়েস পাঠাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে টলস্টয় সৈনিকবৃত্তিকে পেছনে ফেলে লেখ্য বৃত্তিকেই তাঁর জীবনের মূলকর্ম রূপে বরণ করার পথে পা বাড়ালেন।

চাইল্ডহুড লেখা হয় চব্বিশ বছর বয়সে। আগাগোড়াই বইটি আত্ম-সমালোচনামূলক। বয়হুড আর ইয়ুথও আত্মসমালোচনামূলক তবে আত্ম-সমালোচনার রকমফের আছে। ছাব্বিশ বছর বয়সে টলস্টয়ের আত্মসমালোচনা কোন পথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তার একটি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি :

"আমার স্বভাবে নম্রতা নাই। এইটি আমার এক মস্ত গলদ। আমি আসলে লোকটা কী। এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষের চার ছেলের এক ছেলে,

সাত বছর বয়সে অনাথদশা প্রাপ্ত এবং আত্মীয়াদের দ্বারা প্রতিপালিত। না আছে আমার সমাজে চলবার উপযুক্ত শিক্ষা না পাণ্ডিত্য। সতের বছর বয়সে সাবালক হয়েছি কিন্তু বিত্তের প্রাচুর্যে বঞ্চিত এবং সামাজিক প্রতিপত্তিহীন। সর্বোপরি নীতির আমার কোন বালাই নাই। আমি এমন এক মানুষ, যে নিজের ব্যাপারস্থাপার চূড়ান্ত হতদশায় এনে উপস্থিত করেছি, যে কিনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি উদ্দেশ্য কিংবা সুখ বিহনে যাপন করেছে, অবশেষে ককেশাসে আপনাকে নির্বাসিত করেছে ঋণের চাপ এড়াবার জন্য কিংবা তার চেয়েও বড় কথা, বদভ্যাসগুলির পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য।······না আছে আমার প্রভাবশালী বন্ধু, না জানি মার্জিত সমাজে বিচরণ করবার উপযুক্ত আদব-কায়দা। বহু বিষয়ে অজ্ঞ ও বাস্তব জ্ঞানরহিত এদিকে অহংবুদ্ধি অতিশয় টনটনে। এই তো আমার হাল। এই তো আমার সামাজিক স্থিতি।”

টলস্টয় এখানেই থামেননি, নিজের প্রতি সীমাহীন ক্ষোভে নিজেকে চরম আত্মদূষণের শিকারে পরিণত করেছেন। বিপক্ষের প্রতিও বুঝি মানুষ এমন নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে না। যথা :

“আমি কুৎসিতদর্শন, আড়ষ্ট স্বভাব, অপরিচ্ছন্ন এবং সামাজিক শিক্ষাবর্জিত। আমার মেজাজ খিটখিটে, অন্যদের বিরক্তির পাত্র, দুর্বিনয়, অসহিষ্ণু এবং শিশুর মত লাজুক। আমি একটা গবেট বিশেষ। আমার বিদ্যার ঝুলিতে যা আছে তা আমি কোন রকমে সঞ্চয় করেছি মাত্র, তাও ছাড়া-ছাড়া ভাবে, কোন প্রণালী অবলম্বন করে নয়, কিংবা কোনরকম পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই। এমনতর বিদ্যার কোন দাম নাই। আমি অসংযমী, অব্যবস্থিতচিত্ত, অস্থির এবং সাংঘাতিক অহংকারী ও বাহ্বাস্ফোটকারী। আমি ভীরু, মোটেই গুছোনো স্বভাবের লোক নই এবং এতটা কুঁড়ে যে আলস্য আমার বেলায় এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

“আমি নাকি বুদ্ধিমান কিন্তু আমার বুদ্ধিমত্তা কোন কাজেই এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হয়নি। আমার না আছে সংসার বুদ্ধির নৈপুণ্য, না ব্যবসায় বুদ্ধির নৈপুণ্য।

“আমি সৎ। সৎ এই অর্থে যে, আমি সততা ভালবাসি এবং সততাকে মূল্য দিতে শিখেছি। সততা থেকে বিচ্যুত হলে আমার অশান্তির অন্ত থাকে না এবং সততায় ফিরে এলে তবে স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু সততা অপেক্ষাও আমি একটা জিনিস বেশী ভালবাসি। তার নাম যশ। আমি এতদূর উচ্চাকাঙ্ক্ষী

আর আমার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এযাবৎ এতটাই অতৃপ্ত থেকেছে যে, আমাকে যদি ক্ষমা আর সততার মধ্যে একটিকে বাছাই করতে হয় তো আমি বোধহয় প্রথমটিকেই বেছে নেব।

"হাঁ আমি অবিনয়ী, কাজেই অন্তরে অন্তরে আত্মগর্বী, যদিও বাইরে লাজুক ও মুখচোরা।"

ঠিক এই সুরেই তিনি তাঁর চার চারটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের পাঠ্যবস্তু নির্মাণ করেছেন মুখ্যতঃ আত্মসমীক্ষার আধারে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বইয়ের বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছে বয়সোচিত সাফল্য-অসাফল্য, স্খলন-পতনের কাহিনী, শেষ বই মাই কনফেশন-এ বিবৃত হয়েছে এক চরম আধ্যাত্মিক সংকটের বিবরণ। টলস্টয় এ বইয়ে তাঁর ধর্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরপরম্পরা বর্ণনার ছলে স্বীয় পাপজীবনের অকপটতম স্বীকৃতি ও তদ্ভাবদে চূড়ান্ত রকমের অনুশোচনাকে ভাষা দিয়েছেন কিছুমাত্র গোপনতার আবরণ না রেখে। বইয়ের এই অসামান্য বৈশিষ্ট্যটির জন্য সঙ্গতভাবেই এটিকে সন্ত অগাস্টিন-এর 'কনফেশন'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ রুশোর আত্মজীবনীর সঙ্গেও বইটির তুলনা করেছেন। তবে রুশোর 'কনফেশন' আর টলস্টয়ের 'কনফেশন'-এর মধ্যে কিছু মূলগত তফাৎ আছে। রুশোর আত্মজীবনচরিতে স্খলন-পতন-পাপাচরণের অকপট স্বীকৃতি আছে সত্য কথা কিন্তু ওই কবুলনামার পিছনে কোন আধ্যাত্মিক সংকটের ছায়া নাই। পক্ষান্তরে টলস্টয়ের 'মাই কনফেশন' রচিত হয়েছে মূলতঃ তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের সংকট আর নবলব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। জীবনচরিত-কারেরা ১৮৭৯ সালে টলস্টয়ের জীবনে যে 'রূপান্তর' (কনভার্সন)-এর কথা উল্লেখ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নবার্জিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দলিল হলো তাঁর 'মাই কনফেশন'—এক নবদীক্ষান্ত লিখিত ভাষণ। বুদ্ধির দীপ্তি, বিরামহীন আত্ম-অবমূল্যায়নের নির্মমতা, নম্রতা ও আন্তরিকতার দুর্নিবার আকৃতিতে এই বইয়ের প্রতিটি ছত্র ভরপুর। এর পর থেকে টলস্টয় যে জীবন-ধারার দিকে ঝুঁকলেন তাকে আর শিল্পীর জীবন বলা চলে না, বলা উচিত সাধকের জীবন, তপস্বীর জীবন। কাজেই এই পর্বের টলস্টয়কে যে সেণ্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেটা কিছু অকারণে করা হয়নি।

যাই হোক, আমরা আবার কালানুক্রমে ফিরে আসি। টলস্টয়ের সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ করা হচ্ছিল, সে কাজটিই করা যাক।

চাইল্ডহুড-এর পর টলস্টয়ের আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি 'স্কেচেস ফ্রম সেবাস্টো-

পোল' (১৮৫৪-৫৫)। ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এই সামরিক রেখাচিত্রগুলি। বইটি তিনভাগে বিভক্ত—'সেবাস্টোপোল ইন ডিসেম্বর ১৮৫৪,' সেবাস্টোপোল ইন মে ১৮৫৫,' এবং 'সেবাস্টোপোল ইন আগস্ট ১৮৫৫'। রেখাচিত্রগুলিতে লেখক যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যেও সাধারণ সৈনিকদের সারল্য, সাহস, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সেই তুলনায় অফিসারশ্রেণীর মানুষদের তাঁর মনে হয়েছে সংকীর্ণ-চেতা, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু। এঁরা কেউ কারও ভাল দেখতে পারেন না অথচ একই কার্যে ব্রতী হয়ে এঁরা যুদ্ধে এসেছেন। টলস্টয় গোড়ার দিকে যুদ্ধ ব্যাপারটায় খুব উৎসাহী ছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর উৎসাহ জুড়িয়ে আসে। যুদ্ধের ভ্রাতৃঘাতী জিঘাংসা, নিরর্থক রক্তপাত, উত্তেজনা ও ঘৃণার অসুস্থ বিকার তাঁর মোহমুক্তি ঘটায়—গোটা যুদ্ধ জিনিসটার উপরেই তিনি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন। ডায়েরীতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

"কী মূর্খামি আর মূঢ়তা! একজন লোক আর একজনকে হত্যা করে ভাবছে সে যেন এক মহা বীরত্বের কাজ করছে। তাতেই তার সুখ তার আত্মতৃপ্তি! সে কি বোঝে না এতে উল্লাস বোধ করার কোনই কারণ নেই? মানুষকে হত্যা করে কখনও সুখ আসতে পারে না, সুখ আত্মোৎসর্গে।

"এই সুন্দর পৃথিবীতে, এই সীমাহীন তারাভরা আকাশের নীচে, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করতে পারবে না এটা কি কখনও নিয়মের বিধান হতে পারে? প্রকৃতির অপরিমেয় শোভা-সম্পদের ভিতর শত্রুতা, প্রতিহিংসা কিংবা অপরের প্রাণ সংহারের দুর্বার কামনা কখনও কি মানুষের চিত্তে তাদের অধিকার অব্যাহত রাখতে পারে? আমার তো মনে হয় মানুষের অন্তরের যে-কিছু খারাপ চিন্তা, সৌন্দর্য ও শুভের অব্যবহিত আধার প্রকৃতির সান্নিধ্যে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া উচিত।"

এই ভাবটিকেই টলস্টয় সেবাস্টোপোলের গল্পগুলির শেষের দিকে উদাহরণ-যোগে আরও বিস্তারিত করেছেন। পরবর্তীকালে লেখা প্রসিদ্ধ উপন্যাস ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এর প্রকট যুদ্ধবিমুখতা তথা শান্তিকামিতার অঙ্কুর এই লেখাগুলির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। আর সত্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশেও সেবাস্টোপোল কাহিনী পাথিকৃত্যের গৌরব দাবী করতে পারে। এই কাহিনীগুলির মূলে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছে সে বিষয়ে বলতে গিয়ে টলস্টয় লিখেছেন—

"আমার গল্পের নায়ক হলো সত্য। এই সত্যকেই আমি আমার সমস্ত

প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, এবং তার পূর্ণ মহিমায় ও সৌন্দর্যে প্রকটিত করে তুলতে চেয়েছি। সত্য সুন্দর ছিল, সুন্দর আছে, এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল সুন্দর থাকবে।"

টলস্টয়ের সমসাময়িককালের সমালোচকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে রুশ সাহিত্যে এই গভীর সত্যানুরাগ একান্তভাবেই একটা নয়া সংযোজন, যার মূলে টলস্টয়ের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সেবাস্টোপোলের কাহিনী সম্পর্কে নেক্রাসভ এক চিঠিতে লেখেন—"যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এরকম গভীর জ্ঞানগর্ভ সত্য উচ্চারণ করবার ক্ষমতা এমন এক শক্তির ইঙ্গিত করছে যা তদবস্থায় খুব কম লোকেরই আয়ত্ত-গম্য হওয়া সম্ভব। বইটি সেই শক্তিরই প্রমাণরূপে চির বিদ্যমান হয়ে থাকবে। এখন রুশ সমাজে এই জিনিসটিরই সবচেয়ে বেশী দরকার—সত্যের। গোগোলের মৃত্যুর পর থেকে রুশ সাহিত্যে সত্যের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আপনি, (টলস্টয়) আমাদের সাহিত্যে সত্যকে যে আকারে উপস্থিত করেছেন সত্যের সেই রূপ সম্পূর্ণ অভিনব এক বস্তু।"

নেক্রাসভ উপরিউক্ত মর্মে অভিমত প্রকাশ করার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী নেতা প্রিন্স ক্রপটকিন বইখানি সম্পর্কে লেখেন—"তাঁর পর্যবেক্ষণ, যুদ্ধের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান, রুশ সৈনিকের বিশেষ করে সাধারণ রুশ সৈনিকের (যে কিনা দেখতে নিতান্ত সাদামাঠা ও আটপৌরে অথচ যার বীরত্বেই শুধু সম্ভব হয় সত্যি সত্যি যুদ্ধ জেতার কৃতিত্ব) জীবন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাদের উপর নির্ভর করে সেই সৈন্যবাহিনীর আভ্যন্তর মানসিকতার গূঢ়তম বোধ—মোটকথা, সেই সব রচনালক্ষণ যা পরে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বইয়ের কাহিনীকে সুন্দর ও সত্যনিষ্ঠ করে তুলেছিল, তার সবই এই রেখাচিত্রগুলিতে প্রকট দেখতে পাই। বিশ্বের সামরিক সাহিত্যে এ নিঃসন্দেহে এক নতুন ধারা।"

এ বইয়ের আঁকা নক্সাগুলিতে দেখা যায় সাধারণ সৈনিকের প্রতি তাঁর অপার মমতা; তাদের সাহস ও সহ্যশক্তির প্রশংসায় তিনি মুখর। কিন্তু সেনাপতিদের ভূমিকাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে তিনি নারাজ। সামরিক ঐতিহাসিক বা ভাষ্যকারদের রচনায় সেনাপতিদেরই জয়জয়কার, সাধারণ সৈনিকের শৌর্য-বীর্যের কথা কেউ বলে না। টলস্টয় সামরিক প্রতি-বেদকদের এই 'মাথা-ভারী' ধারণাটাকেই পাল্টাতে চেয়েছিলেন তাঁর লেখায়, সাধারণ সৈনিকের বীরত্বকে তিনি তাঁর সামরিক রচনার একেবারে কেন্দ্রমধ্যে

এনে স্থাপন করেছিলেন। সেইদিক থেকে বলা যায় টলস্টয়ই যুদ্ধসাহিত্যে প্রথম গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তক। সেবাস্টোপোল যুদ্ধের চিত্রগুলি গণতান্ত্রিক ধারণায় অনুলিপ্ত বলা যায়।

টলস্টয়-শিষ্য দুখোবরদের নেতা বীরুকফের লেখা থেকে জানা যায়, স্কেচেস ফ্রম সেবাস্টোপোল পড়ে রুশ সম্রাজ্ঞী (দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পত্নী) এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি টলস্টয়ের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং স্বামীকে বলে টলস্টয়কে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক এক বাহিনীতে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করেন। এ কাহিনী কতটা সত্য বলা যায় না তবে এ থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না বইখানি সরকারী মহলেও যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এ তারই নিশানাস্বরূপ।

যুদ্ধে কার্যরত থাকাকালে ও যুদ্ধের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে টলস্টয় আরও কতকগুলি গল্পকাহিনী ও দু-একটি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে এইগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য—'দি কশাকস,' 'দি রেইড', 'দি উডকাটিং', 'নোটস অব এ বিলিয়ার্ড মার্কার', 'টু হুসারস', 'এ ল্যাণ্ডলর্ডস মর্নিং,' 'থ্রি ডেথস', 'লুসার্ন' ও 'আলবার্ট' এবং 'দি ফ্যামিলি হ্যাপিনেস'। এ ছাড়া বয়হুড আর ইয়ুথ-এর কথা তো আগেই বলেছি। এগুলির ভিতর প্রথম বই 'দি কশাকস' আর শেষ বই 'দি ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের অপেক্ষা রাখে।

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত আদিগন্তব্যাপী তৃণক্ষেত্র উচ্চাবচ স্টেপস-এ বসবাসকারী যুদ্ধপ্রিয় জাতি কশাকদের জীবনরীতি টলস্টয় বিশেষ পছন্দ করতেন। অশ্বারোহণে ও যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পটু কশাকদের হিংস্রস্বভাবের কার্কশ্যের মধ্যেও তাদের সরলতা, আন্তরিকতা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, গোষ্ঠীপ্রীতি, অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি গুণ তাঁকে সবিশেষ মুগ্ধ করে এবং একসময়ে কশাকদের জীবনযাপনের ধারা তাঁর এতটাই মন কেড়ে নিয়েছিল যে তিনি সভ্য সমাজের শিষ্ট রীতিনীতি পরিত্যাগ করে কশাকদের মধ্যে তাদের একজন হয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করবার সংকল্প করেছিলেন। সেই সংকল্প অবশ্য কাজে পরিণত করার সুযোগ হয়নি তবে কশাকদের নিয়ে লেখা একটি সুন্দর উপন্যাস তিনি পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছিলেন তার বদলে। 'দি কশাকস্' (১৮৫৪) সেই উপলব্ধিরই ফল। অবশ্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল লেখার আট বছর পরে, ১৮৬২ সালে।

দি কশাকস্ ওই নামের যোদ্ধজাতিকে নিয়ে লেখা উপন্যাস হলেও আসলে

এটি হলো একটি আদিম সারল্যে ভরা বিষাদ-করুণ প্রেমের কাহিনী। গল্পটির মধ্যে একটি রাখালিয়া (idyllic) ভাব নিহিত আছে—বোধ হয় রুশোর জীবন-দর্শন, যার দ্বারা টলস্টয় সবিশেষ প্রভাবিত ছিলেন—ফুটিয়ে তোলবার জন্যই টলস্টয় কাহিনীর ঘটনাবৃত্তের মধ্যে এই রাখালিয়া ভাবের সঞ্চার করেছিলেন। রুশোর তত্ত্বে আদিমসমাজকেই সমস্ত সুখের আকর বলা হয়েছে, সভ্য সমাজকে দুঃখের আকর জ্ঞানে পরিহার করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কশাকস্-এর কাহিনীতে এই তত্ত্বের শিল্পরূপের হদিস মেলে। গল্পটিতে যেমন প্রেমের মাধুর্য আছে, তেমনি আছে প্রেমভঙ্গের বেদনা-বিধুর আর্তি।

পরিব্রাজক ওলেনিন ঘুরতে ঘুরতে কশাকদের এক গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে ধনীর সন্তান, জমিদার, অর্থের প্রাচুর্যে তার আর সব আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত কিন্তু মনের মানুষের দেখা তার আজও মেলেনি। সত্যিকার ভালবাসার জন্য তার অন্তর তৃষিত হয়ে আছে, কিন্তু কোথায় সেই নারী যাকে ভালবেসে সমস্ত সত্তা সার্থকতার আনন্দে ভরে উঠবে? কশাকদের গ্রামে প্রার্থিতা নারীর সাক্ষাৎ পেল ওলেনিন। নাম তার মারিয়াঙ্কা, এক সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী প্রাণোচ্ছলা সুন্দরী যুবতী। মারিয়াঙ্কাকে হৃদয় সঁপে দিলে ওলেনিন, সেই সঙ্গে তার আত্মীয়পরিজন সকলের সঙ্গে তার এক গভীর প্রাণের যোগ স্থাপিত হলো। বিশেষ করে বৃদ্ধ এরস্কাকে তার খুবই ভাল লেগে গেল।

তেরেক নদীর তীরবর্তী পাহাড়ঘেরা গ্রামটিতে বাস করে 'গ্রেবেন কশাক' নামে কশাকদেরই একটি শাখা, তাদেরই ঘরের মেয়ে মারিয়াঙ্কা। কিন্তু ওলেনিন মারিয়াঙ্কাকে ভালবাসলে কী হবে, মারিয়াঙ্কা মনে মনে ভালবাসে তাদেরই স্বশ্রেণীর এক যুবক লুকাশকাকে। লুকাশকার বীরত্বে সে মুগ্ধ। মারিয়াঙ্কা ওলেনিনকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছিল কিন্তু বন্ধুত্ব এক, প্রেমের অন্তর্গূঢ় টান আর। গভীর বেদনার মূল্যে ওলেনিনকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হয়েছিল। কশাকদেরই আর এক শাখা জাতি চেচেনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে লুকাশকা যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এই ঘটনায় মারিয়াঙ্কার মনোভাবে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সে ওলেনিনকে প্রত্যাখ্যান করে বসলো। আশাহত ওলেনিন ব্যর্থতার শূন্যতা বুকে চেপে কশাকদের গ্রাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

উপন্যাসটির পরিসমাপ্তির দুঃখের কারুণ্যের মধ্যেও বোধ করি একটা বক্তব্যের দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। সে বক্তব্য সম্ভবতঃ এই যে, নাগরিক সমাজের ধ্যান-ধারণা নিয়ে সারল্যের প্রতীক গ্রামীণ জীবনকে জয় করা যায় না। গ্রামবালা মারিয়াঙ্কা শহরের শিক্ষাদীক্ষার স্পর্শবর্জিত আদিম জীবনাচরণের আবহে বাস

করলেও সে আবাল্য যোদ্ধজাতির শৌর্য-বীর্যের সংস্কারে লালিতা। কাজেই ওলেনিনের প্রেম খাঁটি হলেও তাকে হৃদয় সমর্পণে মারিয়াঙ্কার বাধা আছে। মারিয়াঙ্কা এমনিতেই লুকাশকাকে ভালবাসতো, লুকাশকার যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের পর সেই ভালবাসা আরও বহুগুণিত হলো। মৃত্যুতে লুকাশকা মারিয়াঙ্কার নিকটতর হলো। তদবস্থায় অপর যুবককে ভালবাসার কোন কথাই উঠতে পারে না। লুকাশকার স্মৃতিই এখন মারিয়াঙ্কার একমাত্র সম্বল, সান্ত্বনা ও আশ্রয়। এই স্মৃতির বাসরে বহিরাগত শহুরে যুবক ওলেনিনের কোন স্থান নেই।

অন্যপক্ষে 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস' (১৮৫৯) নাগরিক পটভূমিকাকে আশ্রয় করে রচিত এক ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী, যার কেন্দ্রে আছে টলস্টয়েরই বিবাহপূর্ব জীবনের এক ঘটনা। সেণ্ট পীটার্সবার্গে থাকতে এক নারীকে তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু দয়িতার কাছ থেকে প্রতিদান দূরের কথা, উপহার পেয়েছিলেন বিশ্বাসভঙ্গ। এই আখ্যানভাগই হলো উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে টলস্টয়ের অন্যান্য একাধিক উপন্যাসের মত এই উপন্যাসটিও আত্মজীবনীমূলক। টলস্টয় যেমন প্রাক-বিবাহপর্বে বাগ্‌দত্তা সোফিয়ার কাছে তাঁর যৌবনের কৃতকর্ম-গুলির কথা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি ধরনে এই উপন্যাসের নায়ক তার প্রেমিকার কাছে তার গোপনজীবনের পাপ অনাবৃত করতে গিয়েছিল সারল্যের তাগিদে। তাতে হিতে বিপরীত ঘটেছিল। জীবনের এক হৃদয়ঘটিত চরম অসাফল্যের অভিজ্ঞতাকে লেখক এই গ্রন্থে চরম শিল্পসাফল্যের এক উজ্জ্বল রত্নখণ্ডে রূপান্তরিত করেছেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, ফ্যামিলি হ্যাপিনেস হয়ত টলস্টয়ের সবসেরা উপন্যাস নয়, তবে শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে এই বইটিকে একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম মনে করা যেতে পারে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

টলস্টয় বিবাহ করেছিলেন ১৮৬২ সালে। বিবাহের পর তাঁর জীবন সুস্থিতি লাভ করে এবং প্রায় পনেরো বছর কাল একটানা একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতির ধারা অনুসরণে অতিবাহিত হয়। এ কথার কার্যকর প্রমাণ হলো এই পনেরো বছর সময়সীমার ভিতর টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস রচিত হয়। উপন্যাস দুটি বিশালায়-তনও বটে। প্রথম উপন্যাস 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', যার রচনা কার্যের শুরু ১৮৬৩ সালে। মোট ছয় বছর লেগেছিল বইটি শেষ করতে। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসের আয়তন দু হাজার পৃষ্ঠারও উপরে। ছাপার দু হাজার পৃষ্ঠা, সুতরাং পুস্তকের কলেবরের বিপুলতা অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'আনা কারেনিনা' (১৮৭৩-৭৭) অত বড় না হলেও তারও আকার বড় কম

হবে না। টলস্টয়ের দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবনের এইটিই বোধহয় সবচেয়ে ফলপ্রসূ কাল আর্টের বিচারে। এর পরে আর তাঁর জীবন নিছক আর্টের চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, আর্টের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজভাবনার জগতে উত্তীর্ণ হয়, যার ইঙ্গিত জীবনী অংশে আমি দিয়েছি, পরে সে বিষয়ে আরও আলোচনা করার অবকাশ ঘটবে।

ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, নামেই পরিচয়, সামরিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত এক অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পকর্ম। দিগ্বিজয়ী দস্যু নেপোলিয়ন তাঁর অজেয় বাহিনী নিয়ে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে একের পর এক রাজ্য জয় করতে করতে পূর্বাভি-মুখী অভিযানের শেষ লক্ষ্যস্থল রুশ দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নেপোলিয়নের সেই দুর্ধর্ষ রুশ অভিযান রুশদের ঐকান্তিক দেশপ্রেম ও ইস্পাত-কঠিন সম্মিলিত প্রতিরোধ ও লৌহদৃঢ় জাতীয়তার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কাহিনী 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাস। রাশিয়ার দুরন্ত শীত নেপোলিয়নের বাহিনীকে কাবু করতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু এ বইয়ে প্রাকৃতিক কার্যকারকতা অপেক্ষা মানবিক কার্যকারকতাকে অনেক বেশী বড় করে দেখানো হয়েছে। এই মানবিক কার্যকারকতাকে নিরন্তর বল যুগিয়েছে রাশিয়ার মানুষের অমোঘ দেশাত্মিকা বুদ্ধি, যার মাহাত্ম্য কীর্তনে বইটি মুখর। সেনাপতিমণ্ডলীর কূটবুদ্ধি অথবা সৈন্য চালনার দক্ষতা অপেক্ষাও সাধারণ মানুষের সাহস ও আত্মত্যাগ এ বইয়ে লেখকের সপ্রশংস মনোযোগ বেশী দাবী করেছে। রণাঙ্গনের অগ্রভাগে যুদ্ধরত সাধারণ সৈনিক, পশ্চাদ্ভাগে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়ালরূপে বিরাজমান অগণিত সাধারণ মানুষের সারি—এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক এরাই। সেনাপতি কুটুজভ যুদ্ধজয়ের উপলক্ষ্য মাত্র। সম্রাটের ভূমিকাও দেশপ্রেমের প্রতীকী তাৎপর্যবহনকারী এক কেন্দ্রশক্তি মাত্র, তার অধিক মর্যাদা তার প্রাপ্য নয়। সমাজের অভিজাত স্তর থেকে আহৃত বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সেনাধ্যক্ষরা জনগণের বলেই কেবল বলীয়ান, তাঁদের আলাদা ভূমিকা নগণ্য।

অর্থাৎ ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এর কাহিনীতে সামরিক ইতিহাসের গণতান্ত্রিক ধারণাকে অত্যন্ত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। আগেই বলেছি যে, সেবাস্টোপোলের গল্পগুলিতে এ আদর্শের প্রথম প্রতিফলন চোখে পড়েছিল, এখানে তাকেই আরও পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসের আবরণে ঐতিহাসিক যুদ্ধকাহিনীর একটি উৎকৃষ্ট মানবিক দলিল।

উপন্যাসটির দুটি ক্ষেত্র—রণাঙ্গন ও গৃহাঙ্গন। রণাঙ্গনের পাশে পাশে

গৃহাঙ্গনের বিবরণ সমান্তরাল ধারায় সমানে বয়ে চলেছে। রণাঙ্গন থেকে গৃহাঙ্গন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এই ভাবটাই বলবৎ করার চেষ্টা হয়েছে দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন কি সমরক্ষেত্রে কি সংসারক্ষেত্রে অবিরত যুদ্ধময়, সংগ্রাম থেকে কোথাও কারও অব্যাহতি নেই।

উপন্যাসে তিনটি অভিজাত পরিবারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে—কুরাগিন পরিবার, রস্টভ পরিবার ও বলকনস্কি পরিবার। কুরাগিন পরিবারের প্রধান কাউণ্ট বেজুকফ অতুল বৈভবের অধিকারী, যৌবনে একজন ডাকসাইটে ভোগী ব্যক্তি ছিলেন। বৃদ্ধ কাউণ্ট বেজুকফের মৃত্যুতে তাঁর বিপুল সম্পত্তির মালিক হবে তাঁর অবৈধ পুত্র পিয়ের। পিয়েরকে জামাতারূপে পাবার জন্য রাশিয়ার অভিজাত পরিবারগুলির কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক কৌশলী বাপের চেষ্টায় তার রূপবতী কন্যা এলেনের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ে। কিন্তু এলেন সুন্দরী হলেও তরলস্বভাবা ও অর্থগৃধ্নু। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই সে স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তার নামে অর্ধেক সম্পত্তি লিখিয়ে দিতে স্বামীকে বাধ্য করে। পিয়ের এক উদারচেতা আদর্শবাদী যুবক, ভাবুক ও উদাসী প্রকৃতির। স্বার্থের প্রতি তার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। কাজেই তাকে মোচড় দিয়ে সম্পত্তি বার করে নিতে এলেনের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এলেন শুধু লোভীই ছিল না, ছিল বিশ্বাসহন্ত্রিণীও। স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হতে তার বাধেনি। অতটা পিয়েরের সহ্য হলো না, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়লো।

অন্যপক্ষে রস্টভ পরিবার রাশিয়ার একটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার কিন্তু অধুনা বেশ কিছু পরিমাণে অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়েছে। দেনার দায়ে সম্পত্তি বেহাত হবার দাখিল। অর্থভাবনায় গৃহকর্তা কাউণ্ট রস্টভের রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সর্বদাই চিন্তা কেমন করে রস্টভ পরিবারের পুরনো মর্যাদা ফিরিয়ে আনা যায়। রস্টভ দম্পতির অনেক সন্তান। পরিবারের বড় ছেলে নিকোলে রস্টভ, সুশিক্ষিত কর্তব্যনিষ্ঠ সংযতচরিত্র। সামরিক বাহিনীতে তার চাকরী হওয়ার কথা আছে, চাকরী পেলে এই পরিবারটির একটি হিল্লে হয়। বড় মেয়ে নাতাশা রূপবতী প্রাণোচ্ছলা সপ্রতিভ। তার সব সময়ের সঙ্গিনী 'তুতো বোন সোনিয়া, ওই পরিবারের আশ্রিতা। অভাবের ক্লেশের মধ্যেও দুই সখীতে মিলে আনন্দের উচ্ছলতায় পরিবারের আবহাওয়াকে কলহাস্যমুখর করে রাখে। নিকোলে সোনিয়াকে ভালবাসে, নাতাশা তার মায়ের সখীর ছেলে বরিসের অনুরক্তা। কিন্তু এ সব অনুরাগ কৈশোরকালীন মন-দেওয়া-নেওয়ার প্রকাশ মাত্র, সেগুলির

অন্য কোন গভীর তাৎপর্য নেই। বিবাহ-পূর্ব জীবনে এ রকম রাগ-অনুরাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে হামেসাই ঘটে থাকে।

তৃতীয় পরিবারের কর্তা কাউন্ট বলকনস্কি প্রাক্তন সেনাপতি, অধুনা স্বীয় জমিদারীতে অবসরজীবন যাপন করছেন। রাশভারী নিয়মানুবর্তী জবরদস্ত ধরনের, কিছুটা বাতিকগ্রস্ত। এক ছেলে এক মেয়ে। পুত্র প্রিন্স আন্দ্রে সৈন্য বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, কর্তব্যপরায়ণ অফিসার। রুশ অভিজাতসমাজের ভোগবিলাস, চটুল জীবনযাত্রা, বিশেষতঃ নারীদের অসার আমোদপ্রমোদ আসক্তি তার ঘোরতর অপছন্দ। পিয়েরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আন্দ্রে বিবাহিত। জীবন দর্শনে দুইয়ের মধ্যে মিল আছে। স্ত্রী লিজা অন্তঃসত্ত্বা, তাকে নিয়ে আন্দ্রে সম্প্রতি কিছু অসুবিধায় পড়েছেন। প্রসবকালে লিজা মারা যান। ভগিনী প্রিন্সেস মারিয়া সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন। অত্যন্ত স্নেহশীলা, ধর্মবতী, শান্ত নিরীহ প্রকৃতির যুবতী। দাপটওয়ালা বাপের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকেন অথচ পিতার সেবা করতে পারলে আর কিছু চান না। প্রিন্স আন্দ্রের সঙ্গে রস্টভ পরিবারের পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রে তিনি নাতাশার সংস্পর্শে আসেন। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। নাতাশা বাগ্‌দত্তা হয়। কিন্তু বিবাহ সংঘটিত হবার পূর্বেই যুদ্ধের ডাকে প্রিন্স আন্দ্রেকে ফ্রণ্টে চলে যেতে হয়।

নারী চরিত্রের অস্থিরমতিত্বের একটা দিক টলস্টয় অঙ্কিত নাতাশা চরিত্রের রূপায়ণে নিষ্ঠুরভাবে দেখানো হয়েছে। নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতার চাপ সহ্য করতে না পেরে খুব সম্ভব তারই প্রতিক্রিয়ায় আনাতোল কুরাগিন নামে এক রূপবান কিন্তু অন্তঃসারশূন্য স্কাউণ্ড্রেল অভিজাত যুবকের ছলাকলার ফাঁদে পা দেয় এবং গোপনে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করার সংকল্প করে। কিন্তু সোনিয়ার চেষ্টায় নাতাশার সংকল্প ব্যর্থ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই নাতাশা তার ভুল বুঝতে পারে কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। নাটাশার এই বিশ্বাসভঙ্গ ও স্খলনের সংবাদ রণাঙ্গনে প্রিন্স আন্দ্রের চিত্তে শেলসম বাজে এবং তাঁকে জীবনের নিরর্থকতায় আরও বেশী বিশ্বাসী করে তোলে। দয়িতার কাছ থেকে পাওয়া এই চরম আঘাত খুব সম্ভব সৌরিয়সমনা যুবক আন্দ্রেকে তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। প্রিন্স আন্দ্রে বোরোদিনের যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হন। আহত অবস্থায় প্রিন্স আন্দ্রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৈবচক্রে রস্টভদের গৃহে নীত হন। নাতাশা আন্দ্রের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে ছুটে যায় এবং প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। আন্দ্রের শেষ মুহূর্তগুলি সুনিশ্চিত মৃত্যুর ছায়াতেও পরম শান্তিতে ভরে ওঠে এই জ্ঞানে যে, নাতাশা

তার ভুল স্বীকার করেছে এবং সে তার কৃতকর্মের জন্ত অনুতপ্তা। ভালবাসার অমৃত স্বাদে মৃত্যুর মুহূর্ত ভরে ওঠে। নাতাশার কোলে মাথা রেখে আন্দ্রে মারা যান। প্রিন্সেস মারিয়াও ভাইয়ের মৃত্যুকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পিয়ের স্বয়ং যুদ্ধ করেননি কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে বন্দী হন। বন্দিদশায় থাকাকালে সহবন্দী প্লাতোন কারতায়েভ নামক এক জ্ঞানী বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কারতায়েভের গভীর নীতিবোধ ও চরম বিপদের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ভাব পিয়েরকে মুগ্ধ করে। ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের মূল কথাগুলি টলস্টয় কারতায়েভের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন এবং প্রকারান্তরে নিজের জীবন দর্শনকেই তদ্দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কাহিনীর উপসংহারে অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডভণ্ড মস্কো শহরের বিশৃঙ্খল অবস্থা. নেপোলিয়ন বাহিনীর ছত্রভঙ্গ দশা ও কুটুজভের বাহিনীর জয়সূচক অগ্রগতি এ সবই চিত্রিত হয়েছে কিন্তু বাস্তববাদী ঐতিহাসিকসুলভ এক ধরনের নির্মোহ নির্বেদ সব বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের নৃশংসতা ও পর্বতপ্রমাণ অসারতা গোটা বইটির অন্যতম কেন্দ্রীয় বক্তব্য। পারিবারিক স্তরে বইয়ের শেষে দেখানো হয়েছে নিকোলে রস্টভের সঙ্গে প্রিন্সেস মারিয়ার বিবাহ সম্বন্ধ এবং পিয়ের ও নাতাশার মিলন। যুদ্ধশেষে শান্তির যবনিকা নেমে এসেছে উত্তাল আলোড়নময় ঘটনাবলীর ধারার উপর।

সব বইয়ের মত এই প্রসিদ্ধ বইটিতেও টলস্টয়ের আত্মজীবনের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। কোন কোন চরিত্রের ভিতর নিকটজনদের ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। যথা, প্রিন্সেস মারিয়াকে এঁকেছেন তিনি তাঁর মায়ের আদলে। প্রিন্সেস মারিয়ার গভীর ধর্মবোধ, করুণা ও আত্মত্যাগের দুর্বার আকৃতি তাঁর মায়ের জীবনী থেকে নেওয়া। যদিও মাকে তিনি মাত্র দেড় বছর বয়সকালে হারান সুতরাং সাক্ষাৎ সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগরূক থাকার কথা নয় তাহলেও লোকমুখে শুনে এবং পারিবারিক ইতিকথার সুবাদে মায়ের এক মহোজ্জ্বল চিত্র শিশুকাল থেকেই তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রভাব পড়েছে প্রিন্সেস মারিয়ার চরিত্রায়ণের ভিতর। এদিকে নিকোলাই রস্টভের রূপরেখাটি এঁকেছেন বাবার চরিত্রের আদলে। নাতাশার চরিত্র নাকি হুবহু এক শ্যালিকার (তানিয়া) চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। কাউন্ট বলকনস্কি অর্থাৎ প্রিন্স আন্দ্রে ও প্রিন্সেস মারিয়ার পিতা ঠাকুরদার আদলে আঁকা। আর স্বয়ং টলস্টয়? তাঁকে এই উপন্যাসে কোথায় কার মধ্যে আমরা দেখতে পাই? অবশ্যই পিয়ের ও আন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনার ভিতর। তিনি তাঁর খানিকটা পিয়েরের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন, বেশ কিছু অংশ আন্দ্রের জীবন দর্শনের ভিতর। পিয়ের আর আন্দ্রে

যেন একই ভাবুক ব্যক্তিত্বের এ পিঠ আর ও পিঠ। সর্বোপরি প্লাতোন কারতায়েভের মধ্যে পাওয়া যায় টলস্টয়ের ক্রীশ্চিয়ান বিশ্বাস ও অহিংসা তত্ত্বে গভীর অনুরাগের প্রতিফলন। টলস্টয় এ উপন্যাসে নানাখানা করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি প্রিন্সেস মারিয়ার স্বার্থশূন্য প্রেম আর আত্মত্যাগের দর্শন প্রকারান্তরে টলস্টয়েরই দর্শন।

যাকে পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় 'ক্লাসিকাল ইউনিটি' বলা হয় ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে তার তেমন পরিচয় পাওয়া না গেলেও পরবর্তী উপন্যাস আনা কারেনিনা-র মধ্যে ক্লাসিকাল ইউনিটির ছাপ অতি স্পষ্ট। শিল্পকর্ম হিসাবে আনা কারেনিনা ওয়ার অ্যাণ্ড পীস অপেক্ষা সার্থকতর সৃষ্টি, যদিও বক্তব্যের মহিমায় ও ঘটনাবলীর জটিলতায় ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এর সঙ্গে অন্য কোন উপন্যাসের কোন তুলনাই চলতে পারে না। শুধু আনা কারেনিনা কেন, বিশ্ব সাহিত্যের আর কোন সৃষ্টিই বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে ওয়ার অ্যাণ্ড পীস -এর সঙ্গে তুলনীয় নয়।

আনা কারেনিনা (১৮৭৩-৭৭) মূলতঃ একটি প্রেমোপন্যাস। এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী এর উপজীব্য। স্বামী স্ত্রী ও স্ত্রীর এক প্রণয়ীকে নিয়ে এই বিখ্যাত উপন্যাসের ঘটনাবৃত্ত গড়ে উঠেছে। ঘটনাবলীর উপসংহারে আছে গভীর বিয়োগান্ত দুঃখ। আলেকজাণ্ডার কারেনিনের পত্নী আনা। আনা সুন্দরী বুদ্ধিমতী যৌবনবতী কিন্তু উচ্চপদস্থ স্বামী তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখলেও স্বামীকে সে ভালবাসতে পারেনি। স্বামীর অসমান বয়স তথা কুরূপ অপেক্ষাও তাঁর স্থূল রুচি ও বিশ্বাস আনাকে অধিক পীড়া দেয়। আনা জননী এক পুত্র-সন্তানের মাতা, কিন্তু সন্তানবতিত্বে স্বামীর প্রতি বিকর্ষণ কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং পুত্রের মধ্যবর্তিতায় স্বামীর প্রতি দূরত্ব আরও বেড়েছে। স্বামীকে ভাল-বাসতে না পারার শূন্যতা এক-এক সময় এতই দুঃসহ হয়ে ওঠে যে জীবন অর্থহীন মনে হয়। ঠিক এমনিতর শূন্যতার মুহূর্তে সৈন্যবিভাগের তরুণ অফিসার সুদর্শন ভ্রনস্কির সঙ্গে পরিচয়। সামাজিক মজলিশে, অপেরায়, রেস খেলার মাঠে মাঝে মাঝে দেখা হয়, পরিচয় ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়।

আনা দাম্পত্য অনুশাসন উপেক্ষা করে তার প্রণয়াস্পদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হতে থাকে। যদিও নিষিদ্ধ প্রেম, তবু সত্যিকারের ভালবাসার এমন কূলভাসানো শক্তি আছে যে তার প্রবল জোয়ারের স্রোতে সকল প্রকার অপরাধবোধ ভেসে যায়, সামাজিক বিধিনিষেধ তার জোর হারিয়ে ফেলে, দেখা দেয় গোটা নারীজীবনের অস্তিত্বে অমৃতস্বাদ আনন্দের মধুময় অনুভূতি! এরূপ

অবস্থায় হৃদয়ের পাত্র সার্থকতার চেতনায় কানায় কানায় উপচিয়ে পড়ে। হয়ত ওই উপচে পড়া অমৃতের পানীয়ে কিছু বিষের ফোঁটা মিশিয়ে থাকে কিন্তু অবৈধ প্রেমের অনির্বচনীয় পরকীয়া রসের উদগ্র সম্মোহনের অবস্থায় ওই বিষ—বিষ বলেই মনে হয় না। আনা ও ভ্রনস্কির পারস্পরিক তীব্র আসক্তির লীলায় অসামাজিক প্রেমের এই বিষামৃতময় আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলাই বুঝি চলতে থাকে একটানা বেশ কিছুদিন।

কিন্তু জীবনের ধর্ম হচ্ছে এই যে, ভালবাসা যত মধুরই হোক, তার দিব্য-ভাবকে এই মর্ত্য সংসারের পার্থিব আবহাওয়ায় বেশীক্ষণ অবিকৃতরূপে ধরে রাখা যায় না। ভালবাসার স্বর্গীয় পুলককে বিস্বাদ করে তুলতে আছে লোকলজ্জা, সমাজ-আরোপিত নিষেধের ভ্রূকুটি, নিন্দা-অপবাদ, তদুপরি আপন অন্তরের পাপবোধের জ্বালা ও ঈর্ষার কুটিলতা। আনা ভালবাসার স্বর্গে বাস করেও এই শেষোক্ত দহনগুলির জ্বালায় নিত্য জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। বিশেষ, ঈর্ষাবিষে সে দগ্ধ হলো। সে স্বামীর সংসার থেকে ভ্রনস্কির সঙ্গে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু পালিয়েও রক্ষা পেলো না। দুর্নিবার প্রেমের আবেগকে আবিল করে তুলতে ঈর্ষার জুড়ি নেই, আর যেখানেই উদ্দাম ভালবাসা, সেখানেই অনভিপ্রেত ঈর্ষার জ্বলুনি-পুড়ুনি। স্ত্রীর কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়ার অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের গ্লানিবোধ এবং সেই সঙ্গে ভ্রনস্কির সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহের কাঁটায় নিত্য ক্ষতবিক্ষত আনার হৃদয় ক্রমে রীতিমত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলো। শেষটা এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে আনা আর এই মানসিক চাপ সহ্য করতে পারলো না, না পেরে এক চরম বিক্ষেপের মুহূর্তে ট্রেনের চাকার তলায় নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে সমর্পণ করে আত্মহত্যা করলো। মৃত্যুতে তার সকল জ্বালার অবসান ঘটলো।

যদিও এই উপন্যাসের বেলায় অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ক্লাসিকাল ইউনিটির আদর্শ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তাহলেও এই উপন্যাসেও একটি দ্বৈত কাহিনীর উপস্থাপনা আছে ক্লাসিকাল ইউনিটি তত্ত্বের ব্যত্যয়ী দৃষ্টান্ত হিসাবে। এই কাহিনী হলো কৃষক লেভিন ও তার স্ত্রী কিটির অনাবিল দাম্পত্য প্রেমের উপাখ্যান। আনা-ভ্রনস্কির অবৈধ প্রেমের উপাখ্যানের পাশে পাশে সমান্তরাল ধারায় বয়ে চলেছে এই মধুর জীবনচিত্রের স্রোত। চাষী জীবনের খুঁটিনাটি, কৃষি জীবনের সমস্যা, রুশ ম্যুঝিকের জীবনযাত্রা সব এই দ্বিতীয় কাহিনীতে অনুপুঙ্খভাবে চিত্রিত হয়েছে চাষের তাবৎ জ্ঞাতব্য বৃত্তান্ত সমেত। চাষের বৈশিষ্ট্যাদি এতটাই নিঃশেষকরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক এক সময়

উপন্যাসের কাহিনীর অনুষঙ্গে সে সব খুঁটিনাটি বিবরণ পাঠকের মনে হাঁফ ধরিয়ে দেয়।*

শিল্পকর্মের ঐক্য ব্যাহত হবে জেনেও টলস্টয় কেন আনা কারেনিনা উপন্যাসে মানবীয় প্রেমের উদ্বেলতাব কাহিনীর পাশে পাশে লেভিন-কিটির এই সরল প্রেমের কাহিনীর সংযোজনা করেছিলেন? সে কি এইজন্য নয় যে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও অসুন্দরতার পাশে কৃষিকেন্দ্রিক পল্লীজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? শহরের মানুষ নানারূপ চিত্তবিক্ষেপের উপকরণাদির সন্ধানে বৃথাই সুখের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু সুখ আলস্য-বিলাসে মেলে না, মেলে না অসার প্রেমচর্চায়, সুখের সন্ধান পাওয়া সম্ভব কেবলমাত্র শ্রমপূর্ণ জীবনের মধ্যে, সেই শ্রমও আবার 'কায়িক শ্রম' হলে সবচেয়ে ভাল হয়। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে সর্বদা ভোগবিলাসের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের মধ্যে বাস করতে চাইলেই বিপত্তি। নাগরিক ধনৈশ্বর্য মানুষকে সুখশান্তি দিতে পারে না, প্রকৃত সুখশান্তির দেখা মিলবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, সরল সহজ জীবন-যাত্রার মধ্যে।

অর্থাৎ টলস্টয় প্রকারান্তরে এই উপন্যাসেও তাঁর এক প্রিয় তত্ত্ব—রুশোর আদিম সরল জীবনের তত্ত্বকেই রূপায়িত করে তোলবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে বাইবেলোক্ত কায়িক শ্রমের আদর্শকেও বড় করে তুলে ধরা হয়েছে লেভিনের কৃষিক্ষেত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা উদয়াস্ত পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা সংস্থানের ছবির উজ্জ্বলতার ভিতর। সহজ খৃষ্টীয় বিশ্বাসের প্রতি গভীর আনুগত্যের এক স্বর্গীয় চিত্র।

কিন্তু তত্ত্বচিত্র যত সারবানই হোক এ বইয়ের আসল সৌন্দর্য তার প্রেমোপাখ্যানের শিল্পোৎকর্ষে। এই উপন্যাসে প্রচারক অপেক্ষা শিল্পীর শক্তিমত্তা অধিক প্রকাশ পেয়েছে। টলস্টয়ের চেয়ে বড় নীতিবাদী লেখক বিশ্ব সাহিত্যে দেখা যায় না কিন্তু আনা কারেনিনা উপন্যাসের মূলকথা নীতিবাদ নয়, মূলকথা মানবীয় কামনার দুর্বার উচ্ছ্বাসের শক্তি ও দুর্বলতা প্রদর্শন। আনার জীবনের ট্রাজিডি পাপের শাস্তির

* প্রসঙ্গতঃ লিখি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকা কালে আনা কারেনিনা উপন্যাস পড়তে গিয়ে তার খুঁটিনাটি বর্ণনার আতিশয্যে বাধা পেয়ে বইখানা পড়া শেষ না করেই ছেড়ে দেন। খুব সম্ভব লেভিনের দৈনন্দিন কৃষিকর্মের খুঁটিনাটি বিবরণে উত্যক্ত হয়েই কবি উপন্যাসটির পাঠে অর্ধপথে ছেদ ঘটান। —লেখক। ('টলস্টয় ও ভারতবর্ষ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

কথা মনে করিয়ে দেয় না, মনে করিয়ে দেয় সামাজিক অনুশাসন ও আত্মবিস্মৃত প্রবল কামনার অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত এক অসহায় নারীর অনিবার্য বিধ্বংসী পরিণামের কথা, যে পরিণাম পাঠকচিত্তে গভীর বিষাদের সৃষ্টি করে, জাগিয়ে তোলে আনার জন্য অন্তহীন করুণা। শিল্প হিসাবে আনা কারেনিনা উপন্যাসের এখানেই সার্থকতা।

অধ্যাপক ফ্যাগেট, অধ্যাপক চার্লস সারোলিয়া, টলস্টয়ের জীবনীকার মিঃ ভিক্টর শ্লোকভ্‌স্কি প্রমুখ বিদগ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে আনা কারেনিনাই হলো টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আমাদের দেশেও কোন কোন রসজ্ঞ সমালোচক এই মতের অনুবর্তী। শিল্পকর্মের মহত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে একথা যথার্থ বটে তবে শিল্পই তো মানুষের জীবনের একমাত্র ধ্যেয় নয়। শিল্পের চেয়েও মহত্তর মানবীয় আদর্শ কখনও কখনও মানুষের অন্তরকে বেশী নাড়া দেয়। অস্তিত্বের মৌল সমস্যাগুলি শিল্প অপেক্ষা মানুষের ভাবনাচিন্তাকে গভীরতরভাবে আলোড়িত করে এটা সংসারের পরীক্ষিত সত্য। নিছক শিল্পসৌন্দর্যে মানুষের মন ভরে না। তার সঙ্গে উদারতম মনুষ্যত্বের বোধ যুক্ত হলে তবেই শিল্পসৃষ্টি প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে।

শেষোক্ত মানদণ্ডে বিচার করে সমালোচকদের আর এক অংশ আনা কারেনিনা অপেক্ষাও রেসারেকশন উপন্যাসটিকে সমধিক মূল্য দিয়ে থাকেন। রেসারেকশন উপন্যাসের শিল্পসৌন্দর্যও অনুপম কিন্তু তার সঙ্গে সর্বোন্নত পর্যায়ের মানবতা যুক্ত হয়ে তাকে শিল্পকর্মের এক ভিন্ন কোটিতে স্থাপন করেছে। টলস্টয় যখন এই উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করেন তখন তাঁর বয়স সত্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। লেখকের পরিণত জীবনের সমৃদ্ধ শিল্প-অভিজ্ঞতা, লিপিনৈপুণ্য, প্রাজ্ঞ জীবনদর্শন এই উপন্যাসটিতে এসে তার সম্মিলিত শ্রেষ্ঠ সুফল লাভ করেছে। সুতরাং দেশী-বিদেশী সমালোচকদের একাংশ যখন রেসারেকশনকে টলস্টয়ের মহত্তম শিল্পকর্ম রূপে অভিহিত করেন তখন সে কথা অযৌক্তিক বলা যায় না।

আনা কারেনিনা উপন্যাস সমাপ্ত হওয়ার পরে টলস্টয় দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নীতিবাদী স্তরের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অধিক ব্যস্ত ছিলেন। ফলে শিল্পের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বলতে গেলে ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে প্রায় দেড় দশক কি দুই দশক কাল একাদিক্রমে তিনি মননের রাজ্যে অবিচ্ছেদে ভ্রমণ করেছেন। এর মধ্যে যদি তিনি কখনও-সখনও ছোটগল্প, নাটক বা উপন্যাসে দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন তো সে জিনিস স্বাদ বদলের প্রকরণ হিসাবে করেছেন, নচেৎ তাঁর মূল মনোযোগ

এই সময়ে ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবনা-চিন্তার জগতেই মুখ্যতঃ সংলগ্ন ছিল দেখা যায়। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে জীবনী অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

১৮৮০ সাল থেকে ১৯০০ সালের ভিতর টলস্টয় যে সব সৃষ্টিধর্মী পুস্তক রচনা করেছেন তার মধ্যে আছে 'দি ডেথ অব আইভান ইলিচ' (১৮৮২-৮৬) নামক উপন্যাস, 'হাউ মাচ্ ল্যাণ্ড ডাজ এ ম্যান নীড' (১৮৮৬) নামক গল্প-সংগ্রহের গল্প, 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' (১৮৮৬) নাটক, 'দি ক্রুশজার সোনাটা' (১৮৮৯) উপন্যাস, 'দি ফ্রুটস্ অব এনলাইটেনমেণ্ট' (১৮৮৮) নাটক, 'দি ডেভিল' (১৮৯১) উপন্যাস, এবং সর্বশেষে 'রেসারেকশন' (১৮৯৯) উপন্যাস।

দি ডেথ অব আইভান ইলিচ নীতিগর্ভ উপন্যাস। তবে নীতিকেও ছাপিয়ে কঠিন বাস্তবতার অনুভূতিতে গল্পাংশ সমধিক মণ্ডিত। ব্যাধিভাবনা, মৃত্যুচিন্তা, চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের হাতুড়েপনা ও অর্থগৃধ্নুতা, আমলাতন্ত্রের ক্রূরতা, বিবাহ ও গার্হস্থ্যসুখ সম্বন্ধে বুর্জোয়া ধারণার উপর আক্রমণ প্রভৃতি কাহিনীর আখ্যানাংশে প্রধান জায়গা জুড়ে আছে। আইভান ইলিচ এক সুখী সচ্ছল ব্যক্তি। জীবনকে নিজের মত করে সাজাবার পরিকল্পনায় তাঁর উদ্যমের অভাব ছিল না। কিন্তু এক দুর্ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল—তাঁর ভিতরকার এক সুপ্ত ব্যাধিকে জাগিয়ে তুলল। আইভান ইলিচ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেন। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি যেন তাঁর অতীত জীবনকে সারিবদ্ধ এক দৃশ্যপরম্পরার মিছিলের মত স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলেন। যে জীবন তিনি হারাতে বসেছেন সে জীবন তাঁর সমস্ত স্বার্থময়তা ও অর্থহীনতা নিয়ে তাঁর চোখে প্রতিভাত হলো। মোপাসাঁর অনুরূপ এক গল্পের কাহিনীর সঙ্গেই কেবলমাত্র এর গল্পাংশ তুলনীয়।

ক্রুশ্জার সোনাটা প্রেমোপাখ্যান, কিছুটা আদিরসাশ্রিতও বটে, তবে এই উপন্যাসে লেখক সব ছাড়িয়ে বিবাহের অসারতা এবং নারীর অন্তঃসারশূন্যতাকেই বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবাহ সম্পর্কে টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে নির্মমতার ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর একান্ত স্বকীয় অনুভব। টলস্টয় বিবাহিত অবস্থা থেকে কুমার বা কুমারীত্বের অবস্থাকেই বেশী কাঙ্ক্ষনীয় মনে করেন—শুধু ধর্মীয় হিতাহিতের বিচার থেকেই নয়, ব্যক্তির সামাজিক উপযোক্তিতার দিক থেকেও বটে। কামজ ভালবাসা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জীবনে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে এক প্রধান প্রতিবন্ধকস্বরূপ। অবিবাহিতরূপেই মানুষ সমাজের বেশী উপকার সাধন করতে পারে বলে টলস্টয়ের বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসকেই ক্রুশ্জার সোনাটা বইয়ে চমৎকার শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে প্রিন্স আন্দ্রে তাঁর বন্ধু পিয়েরকে বিবাহের শৃঙ্খলিত

বন্ধনদশা এবং নারীর চটুলতা সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এ উপন্যাসে সেই কারণটিরই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ-প্রথাকেই এ উপন্যাসে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। টলস্টয়ের মতে একজন অনূঢ়া বয়স্কা নারী বিবাহিতা নারী অপেক্ষা সমধিক শ্রদ্ধেয়া। এই ভাবটিকে লেখক বিস্তার করেছেন এমন এক কাহিনীর মাধ্যমে, যে কাহিনীর কেন্দ্রে আছে এক খুনী ব্যক্তি, যে সন্দেহবশে তার স্ত্রীকে হত্যা করে প্রকাশ্যে সেকথা কবুল করতে পিছপা হয়নি। যৌননীতিবোধের উপর এ উপন্যাসের কাহিনীর প্রতিষ্ঠা, সুতরাং এটিকেও এক হিসাবে 'দি ডেভিল' উপন্যাসের সগোত্র রচনা মনে করা যেতে পারে।

ক্রুশ্‌জার সোনাটা উপন্যাসে টলস্টয়ের যে মানসিকতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে এককালীন সোপেনহৃর ও খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান। নারী-বিদ্বেষের ভাবটি নেওয়া হয়েছে সোপেনহৃর থেকে (ষাটের দশকের শেষের দিকে এক সময়ে টলস্টয় সোপেনহ্যরের রচনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে মনে করতেন পৃথিবীর সব সেরা দার্শনিক।—লেখক)। আর কৌমার্যকে মহিমান্বিত করা হয়েছে বাইবেলের শিক্ষা প্রভাবে।

টলস্টয়ের এই দুই মতের ভালমন্দ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হচ্ছে না, শুধু বলতে চাই শিল্পরূপের আশ্রয়ে বিশ্বাসের গভীরতাকে পরিস্ফুট করে তোলার ক্ষেত্রে ক্রুশ্‌জার সোনাটা উপন্যাসের তুলনা নেই।

ক্রুশ্‌জার সোনাটা বইতেও চিকিৎসাবৃত্তিজীবীদের উপর নির্মম ব্যঙ্গ আছে। এই ব্যঙ্গ টলস্টয়ের মনোভঙ্গীরই উপযুক্ত। চিকিৎসাজীবীদের উপর এই ক্ষমাহীন আক্রমণ টলস্টয়কে মঁতেন, মলিয়ার, রুশো প্রভৃতি পূর্বাচার্য এবং বার্নার্ড শ' প্রমুখ সমসাময়িক লেখকদের সমভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যদিও এঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীতে বহুতর পার্থক্য। সঙ্গীতের সম্মোহনী প্রভাবের ক্ষতিকর দিকটিও এই উপন্যাসের কাহিনীতে তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে।

দি ডেভিল উপন্যাস এবং দি পাওয়ার অব ডার্কনেস নাটক এই দুই রচনা দ্বয়ের বিষয়বস্তুতে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য এসেছে যৌনতার চিত্রণ থেকে। দুটি কাহিনীই লাম্পট্যের কাহিনী এবং দুটি কাহিনীতেই নারীকে উপভোগ করে তাকে গুম করে ফেলার ঘটনাবৃত্ত বাস্তবতার সঞ্চার করেছে যা মনের উপর কটুস্বাদ প্রভাবের ছাপ ফেলে! তবে উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের এখানে পার্থক্য যে, নাটকে পাপকে অনুতাপের দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শোধিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে, উপন্যাসে ওই ভাব কম।

রুশ সমালোচকদের অভিমত, এই দুই শিল্পকর্মের ঘটনার ছকের মধ্যে টলস্টয়ের আত্মজীবনী পরোক্ষ হলেও কিছু পরিমাণে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। অনিয়ন্ত্রিত নারীসঙ্গের ঘটনাবৃত্ত, যা এই বই দুটিতে দেখানো হয়েছে, গ্রন্থকারের প্রাক্‌বিবাহ জীবনের উচ্ছৃংখল যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অভিমত কতদূর সত্য অথবা আদৌ সত্য কিনা সে কথা আমরা বলতে পারব না, তবে টলস্টয়ের যৌবনকালীন অভিজ্ঞতা যে এই দুই পুস্তক রচনায় মূল্যবান উপাদানের কাজ করেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যৌন প্রেম টলস্টয়ের দ্বারা কঠোর ভাবে ধিক্কৃত হলেও শিল্পের বিষয় হিসাবে তাকে তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে। নারী ও নারীঘটিত সমস্যা তাঁর লেখায় বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে। সেই সত্যেরই প্রমাণ পাই এই দুটি শিল্পকর্মের ছাঁচের ভিতর। এই স্থলে উল্লেখ্য, 'ডেভিল' উপন্যাস টলস্টয়ের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। এই বিলম্বিত প্রকাশের নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ ছিল।

'রেসারেকশন' বা পুনর্জন্ম গভীর নীতিবোধের দ্বারা সংক্রামিত উপন্যাস। তা বলে শিল্প সৌন্দর্যে মোটেই ন্যূন নয় এর কাহিনীর উপস্থাপনা। বাইবেলীয় 'পুনরুজ্জীবন' তত্ত্ব,—ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণের পর যীশু খৃষ্টের কবর থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনী—এই উপন্যাসে চমৎকার একটি শিল্প-রূপকে প্রকাশিত করেছে। সমাধির অন্ধকার থেকে আলোর জগতে উত্তরণ, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার পাপ থেকে পুণ্যের সংসারে জেগে ওঠা। উপন্যাসটিতে বাস্তব সত্যেরও বিশেষ স্পর্শ লেগেছে। আনা কারেনিনা উপন্যাসের মত এই উপন্যাসের কেন্দ্রেও আছে একটি প্রকৃত ঘটনার আভাস। ১৮৮৭ সালের এক আদালতের বিচার কাহিনী—এক পতিতা নারীর চৌর্যাপরাধে বিচারকালে জুরীদের একজনার অত্যদ্ভুত আচরণ। সংশ্লিষ্ট জুরী পতিতার স্খলন-পতনের দায় নিজের স্কন্ধে তুলে নেবার জন্য এগিয়ে আসেন এবং পতিতাটিকে শাস্তির কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু রোগজর্জরিতা অপরাধিনীর হাজতবাস কালেই মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটি সেই সময় রুশ আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, টলস্টয়ের পরিণত মনন শিল্প ভাবনা ও প্রজ্ঞা এই উপন্যাসে এক চমৎকার সামঞ্জস্যের চেহারা ধারণ করেছে। শিল্প অপেক্ষা যাঁরা জীবনকে বড় বলে মনে করেন তাঁরা এই উপন্যাসকে নিঃসন্দেহে টলস্টয়ের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিরূপে অভিহিত করতে চাইবেন। নন্দন-

বাদীদের অভিমত হয়ত এই ধারণা থেকে অন্যরকম হতে পারে, হওয়াই সম্ভব।

নেখলুডভ এক বিলাসী ভোগী প্রকৃতির যুবক। আত্মীয়গৃহে ছুটি কাটাতে এসে সে দাসীকন্যা কাটুসা মাসলোভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। ঘনিষ্ঠতা এক সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়। ছুটি শেষে নেখলুডভ স্বস্থানে ফিরে আসে এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভোগী যুবকের পক্ষে যা স্বাভাবিক, মেয়েটির কথা বেমালুম ভুলে যায়। কাটুসা সন্তানসম্ভবা হয়। কুমারীকন্যার স্খলন, বিশেষ কুমারী পরিচারিকাকন্যার স্খলন, প্রভুগৃহের মর্যাদার পক্ষে চরম আঘাতরূপে গণ্য করা হয়। সে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। কলঙ্কের বোঝা মাথায় বয়ে কাটুসা আশ্রয়ের আশায় দোর থেকে দোরে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথাও তার জায়গা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে যা অবধারিত তাই ঘটলো। কাটুসা গণিকাবৃত্তির পঙ্কে নিক্ষিপ্ত হলো। ধীরে ধীরে সে এক পাপ থেকে অন্য পাপে বিচরণ করতে করতে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, এমনকি খুনের দায়ে ধরা পড়ে! সাইবেরিয়ায় তার নির্বাসনদণ্ড হয়।

বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে কাটুসার সঙ্গে নেখলুডভের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নাটকীয় সাক্ষাৎকার। নেখলুডভ ছিল বিচারকালে জুরীদের অন্যতম। দশ বৎসর পরে হলেও কাটুসাকে চিনতে তার ভুল হয় না। পুরাতন ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি মনে পড়ে। কাটুসাকে আর চেনা যায় না। যে ছিল একদা এক সরলবিশ্বাসী সহজ অন্তঃকরণ নিষ্পাপ বালিকা, সে এখন এক দজ্জাল স্বভাবের লজ্জাহীনা প্রগলভা নারী—কথায় কথায় সহ-বন্দীদের সঙ্গে ঝগড়া করে, চীৎকার করে চারদিকের আকাশ ফাটায়, রেগে গেলে চারপাশের লোকেদের আঁচড়ায় কামড়ায় আরও কত কী করে। কুঁদুলে বলে এখন তার বেজায় অখ্যাতি।

কাটুসার এই হীন দশায় নেখলুডভ খুবই দুঃখিত হয়। তার অন্তরে বিবেকের পীড়ন দেখা দেয়। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে ভাবে এই নারীর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য সেই সম্পূর্ণ দায়ী। তার কৃতকর্মের জন্যই কাটুসার আজ এই হতদশা। সে যদি বালিকার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত না করতো তো কাটুসার জীবন এই পথে মোড় নিত না এবং আজ তার সামনে সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার সকল সম্ভাবনা এমন সাংঘাতিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যেত না। এই মেয়েটির সর্বনাশের সমস্ত দায়িত্ব তার এবং সেই এর জন্য একমাত্র দায়ভাগী।

নেখলুডভ প্রায়শ্চিত্ত সাধনে কৃত সংকল্প হলো। কাটুসাকে স্বাভাবিক

জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায় সে সাইবেরিয়ার গিয়ে উপস্থিত হলো। চললো তার দিনের পর দিন অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন। অনুতাপের অশ্রুজলে পাপকে ধুয়ে মুছে সাফ করবার এই ব্রতে সে নিজের উপর চরমতম দুঃখের ভার চাপাতে দ্বিধা করলো না। তার পাপের ফলেই কাটুসার জীবনে এমন দুর্বিষহ অভিশাপের বোঝা চেপেছে। এই পাপের জড় নিশ্চিহ্ন করবার মানসে সে নিজের উপর কঠিনতম শাস্তি প্রয়োগে প্রস্তুত হলো। ততদিনে কাটুসার নির্বাসনের দণ্ডভোগের মেয়াদ ফুরিয়েছে। তার দেশে ফেরার সময় হয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরতে চাইলেই দেশে ফেরা যায় না। চাই উপযুক্ত বাহন, উপযুক্ত আচ্ছাদন, উপযুক্ত খাদ্যাহারের সংস্থান। এসবের ব্যবস্থা করবে কে? তদুপরি কাটুসা অশক্তা, আরোগ্যের অতীত রোগে পীড়িতা, প্রায় বিকৃতমস্তিষ্কা বললেও চলে। সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে হাজার মাইল বরফের পথ বেয়ে তাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা এক চরম অগ্নিপরীক্ষা। নেখদুলভ এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সংকল্প করলে।

সে কাটুসার জন্য শ্লেজ গাড়ী ভাড়া করলে। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সেও চলতে লাগলো। যেখানে কুকুরে-টানা কিংবা ঘোড়ায়-টানা শ্লেজের অভাব সেখানে নিজেই বরফের উপর দিয়ে শ্লেজ টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। পথে আহার-পথ্য-শুশ্রূষার দ্বারা হতভাগিনীর সেবা করলো, কাটুসা রোগযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলে তাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো, তার চিত্তক্ষতে ক্রমাগত শান্তির প্রলেপ বুলোতে বুলোতে চললো—এইভাবে দিনের পর দিন চরমতম আত্ম-নিগ্রহের মধ্য দিয়ে পাপস্খলনের এক দুশ্চর তপস্যা চলতে থাকলো। প্রায়শ্চিত্ত-করণের নামে এমন দুরূহ তপশ্চর্যার কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল? নেখদুলভ সেই কঠিন পরীক্ষায় আপনাকে সসম্মানে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল এ কথা বলতেই হবে।

বইয়ের রেসারেকশন বা পুনর্জন্ম নামের এখানেই তাৎপর্য যে, কাটুসার সঙ্গে সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে সাক্ষাতের পর থেকে নেখদুলভের কাছে জীবনের অর্থই বদলে গিয়েছিল—সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুস্থ জীবনে কাটুসার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সে নিজেই নবজীবনে পুনর্বাসিত হলো।

কিন্তু কাটুসা নেখদুলভের ভাগ্যের সঙ্গে তার নিজের ভাগ্য পুনরায় জড়াতে চায়নি। নেখদুলভ তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। সে সেই প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। যে যুবক একদা তাকে কামের মধ্য দিয়ে পেতে

চেয়েছিল, সে যুবক এখন বয়সের ভারে আত্মস্থ হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাকে পেতে চায়। এক্ষেত্রেও নারী পুরুষের ইচ্ছা পূরণের সহজ যন্ত্র বই আর কিছু নয়। সাইবেরিয়ার বন্দিনিবাসে বিপ্লবী সাইমনসনসের সঙ্গে কাটুসার পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কাটুসা বিপ্লবী সাইমনসনসকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে সম্পূর্ণ নয়া পথে তার জীবনকে পরিচালিত করে। তার মানসিক পুনর্জন্ম ঘটে।

এই উপন্যাসেও টলস্টয়ের আত্মজীবনের ছাপ স্পষ্ট। পাপাচরণ, পাপাচরণের জন্য অনুশোচনা এই দুটি ঘটনাক্রমই টলস্টয়ের জীবনের সঙ্গে আশ্চর্য মিল মনে করিয়ে দেয়। বিশেষ, ১৮৭৯ সালের পর থেকে টলস্টয়ের নবদীক্ষার কথা কে না জানেন? অস্তিত্বের এক মৌলিক আধ্যাত্মিক সঙ্কট থেকে তাঁর জীবনে এই লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা। অতীতের কৃতকর্মের জন্য সান্ত্বনাহীন অনুশোচনা ও জীবনকে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার দুর্নিবার আকুতি টলস্টয়ের শেষ তিরিশ বছর কালকে তাঁর পূর্বের পঞ্চাশ বছরের বয়ঃসীমা থেকে পুরোপুরি আলাদা করে দিয়েছিল। টলস্টয়ের নিজ জীবনের এই পুনর্জন্মের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের রেসারেকশন উপন্যাসের নায়ক নেখলুডভের পুনর্জন্মের পরিমাপ করতে হবে। জীবন কেমন করে কখনও কখনও শিল্পের সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিশে যায় এ তারই উদাহরণ।

শুধু কাহিনীর মূল্যেই বইখানি মূল্যবান নয়, সেই সঙ্গে তার সমালোচনাত্মক দিকটিও বিশেষ প্রণিধান করবার মত একটা দিক। এই উপন্যাসে টলস্টয় রাশিয়ার শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন, রুশ অর্থোডক্স চার্চের সংস্কারাচ্ছন্ন নিয়মনীতিকে কঠিন ভাষায় করেছেন আক্রমণ। সর্বোপরি নির্যাতিত ধর্ম সম্প্রদায় দুখোবরদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন নির্ভীকভাবে চার্চের ভ্রূকুটি-কুটিল উষ্মা উপেক্ষা করে। অবশ্য এ জন্য টলস্টয়কে মাশুলও গুণতে হয়েছে কঠিন দণ্ডের মূল্যে—দুখোবরদের পক্ষাবলম্বনের জন্য সম্রাট তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হন, রুশীয় চার্চ তাঁকে স্বীয় ধর্মমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করে। বিশ্বাসের জন্য মূল্য দিতে টলস্টয় এতটুকু পেছ-পা হননি।

রেসারেকশনের পরেও টলস্টয় আরও দু'একটি কাহিনী ও নাটক রচনা করেছিলেন। যেমন হাজি মুরাদ (১৯০৪) উপন্যাস ও দি লিভিং কর্প্‌স (১৯০০) নাটক। হাজি মুরাদ উপন্যাসে কামারের ছেলে হাজি মুরাদ এক অত্যাচারীর (শামিল) কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আর এক অত্যাচারীর (জার প্রথম নিকোলাস) কবলে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীর উন্মত্ততা ও হিংসাচারের বিরুদ্ধে হাজি

মুরাদের কাহিনী এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। দি লিভিং কর্প্‌স আখ্যায়িকার নায়ক ফেদিয়া প্রোটাসভ আত্মহত্যার ভান করে কার্যতঃ শহরের ভবঘুরেদের দলে গিয়ে ভেড়ে। সর্বদাই দেখা যায় যাযাবরত্বের জন্য এক দুর্মর কামনা প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুতীব্র অসন্তোষ ও অতৃপ্তির ফল। ফাদার সার্জিয়াস্ উপন্যাসে প্রিন্স কামাকস্কি সংসারের ধরনধারণে বীতস্পৃহ হয়ে প্রথমে এক ধর্মীয় মঠে আশ্রয় নেন, পরে বাউণ্ডুলে ভ্রাম্যমাণ জীবন বরণ করেন। এ আর কিছু নয়, প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই এ প্রতীক।

ছোট গল্পে টলস্টয়ের প্রতিভা অনন্যসাধারণ। তবে প্রথম ও শেষপর্বে ছাড়া মধ্য পর্বে ছোট গল্প তিনি বড় একটা লেখেননি। প্রথম পর্বের গল্পগুলির মধ্যে দি রেইড, দি উডকাটিং, টু হুসারস, এ ল্যাণ্ডলর্ডস মর্নিং, লুসার্ন, আলবার্ট প্রভৃতি রচনা সমধিক বিখ্যাত। আর শেষ পর্বের ছোটগল্পসমূহের মধ্যে পাই বোকা আইভান, বাঁচবার জন্য মানুষের ক' হাত জমি দরকার?, ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অপেক্ষমাণ, মানুষ কী অবলম্বন করে বাঁচে? প্রভৃতি অবিস্মরণীয় সব রচনা, যেগুলি পরে 'টুয়েন্টি-থ্রি টেল্‌স্' নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহে একত্র সংকলিত হয়।

টলস্টয়ের শেষ বয়সের গল্পগুলি নীতিমূলক এবং বাইবেলের প্যারাবলের কথন-ভঙ্গীর অনুসরণে অতিশয় সরল ও সহজ ভাষায় রচিত। এ সব গল্পের শিল্প-শৈলী শিল্পীগুরুর পরিণত বয়সের প্রচারিত সাহিত্যতত্ত্বের (যা কিনা বিধৃত আছে তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট' নামক প্রসিদ্ধ শিল্পচিন্তা বিষয়ক গ্রন্থে) সঙ্গে সবিশেষ সঙ্গতিযুক্ত। শ্রমজীবি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপকরণ-উপাদানের সমবায়ে গল্পগুলির বিষয়বস্তু গঠিত এবং জনগণের কল্যাণ গল্পগুলির মূল ধ্যেয়। শিল্পোৎকর্ষের লক্ষ্যকে গৌণ স্থান দিয়ে টলস্টয় এ সব রচনায় সমাজ-হিতকেই প্রধান লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেভাবেই গল্পগুলিকে আকার দান করেছেন। যেমন বোকা আইভান গল্পে রণলিপ্সা ও বাণিজ্যিক মুনাফা-গৃধ্নুতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং সেগুলির পিঠে পরিশ্রমনির্ভর কৃষিকেন্দ্রিক সরল জীবনের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষুদে শয়তান এবং রুটির খোসা গল্পে মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ কী অবলম্বন করে বাঁচে এবং দুই বৃদ্ধ গল্পদ্বয়ে করা হয়েছে দয়া দাক্ষিণ্য ও পরার্থপরতার মাহাত্ম্য কীর্তন। মানব প্রেম ও মানব সেবার মহত্ত্বের ভাবটি সবচেয়ে সুন্দর ফুটে উঠেছে যেখানেই

ভালবাসা সেখানেই ঈশ্বর নামক গল্পে। অন্যদিকে বাঁচবার জন্য মানুষের ক'হাত জমি দরকার ? গল্পে আছে জমির অপরিমিত লোভের কঠিন সমালোচনা। শূন্য ঢাক গল্পে দেখানো হয়েছে খামার করার কুফল।

তবে আর্টের বিচারেও গল্পগুলির সৌন্দর্য অনুপম। মুখ্যত: এ সব গল্পের কথা মনে রেখেই ডি. এইচ. লরেন্স টলস্টয়কে পৃথিবীর অন্যতম সেরা গল্পলেখক রূপে অভিনন্দিত করেছেন। একজন প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশীল লেখকের এই প্রশংসা থেকেই প্রমাণ হয়, গল্পগুলির আর্টের আকর্ষণও বড় কম নয়।

টলস্টয় যখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের যুবক তখন তিনি ককেশীয় লোক-কাহিনীর ধরনে কতকগুলি গল্প রচনা করেন। পরে ১৮৭২ সালে শিশুদের পাঠের সহায়তা কল্পে যে 'এ বি সি' পুস্তক রচনা করেন তাতেও কতকগুলি নীতিগল্প সন্নিবিষ্ট করেন। টুয়েন্টি-থি্‌ টেল্‌স্‌-এর গল্পগুলি এই ধারারই অনুক্রম। এখানে কাহিনী, নীতি, রূপক একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চর্মকার জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ ও বাঁচবার লড়াইকে এই সংগ্রহের একাধিক গল্পে মূল বিষয়বস্তু রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এটা অকারণে করা হয়নি। প্রথমত: কায়িক শ্রমের আদর্শকে মর্যাদা দেওয়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়ত: অবনত-নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতীক হিসাবে মুচি সম্প্রদায়কে গ্রহণ করে তিনি তাঁদের প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, টলস্টয় কায়িকশ্রমের আদর্শের প্রতি আনুগত্যবশতঃ শেষ বয়সে স্বয়ং জুতো সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলেন এবং নিজের বুট নিজেই মেরামত করতেন। ঈশ্বরভক্তি, সরল জীবন, শ্রমশীলতা, স্বল্পে তুষ্টি—এ সব বরণীয় মূল্যবোধকে চিহ্নিত করবার জন্যই তাঁর মুচির জীবন-যাত্রাকে প্রতীকরূপে নির্বাচন। সর্বহারা মানুষের সঙ্গে শিল্পের সাহায্যে এমনি-ভাবেই একাত্মতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন তিনি।

নীতির প্রশ্নে দেখা যায়, তিনি গল্পের প্লটে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ কিংবা ঈশপের গল্পের ধরনে চমৎকার নীতিশিক্ষা সংযোজন করতে জানতেন। বাঁচবার জন্য মানুষের ক'হাত জমি দরকার ? গল্পটির কথাই ধরা যাক। মানুষ সম্পত্তি নিয়ে লড়াই করে, এক হাত জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে করে বিবাদ, এক চিলতে জমির অধিকার নিয়ে জমিদারে জমিদারে বেধে যায় রক্তাক্ত সংঘর্ষ। কিন্তু এ সব বাদবিবাদ দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি কাটাকাটি কতই না অর্থহীন। ভূমিলোভ বস্তুটা যে কত অসার ও ঘৃণ্য সেইটি বোঝাবার জন্যই লেখক এই অবিস্মরণীয় গল্পের প্লটটি ফেঁদেছেন। স্বভূমি ও স্বগৃহ থেকে অনেক

অনেক দূরে বাসকির উপজাতি অধ্যুষিত স্টেপস অঞ্চলে এক কৃষকের জমি কিনতে যাওয়ার কাহিনীর উপস্থাপনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন বেঁচে থাকতে জমির জন্য এত যে খেয়োখেয়ি হানাহানি, মৃত্যুর পরে সেই জমিরই চার-পাঁচ হাতের বেশী দরকার হয় না - কবর খোঁড়ার জন্য, মৃত ব্যক্তিকে তাতে শায়িত করবার জন্য। জমিলোভের অন্তিম পরিণাম যখন এই, তখন মানুষ কোন্ বুদ্ধিতে জমির জন্য সারাজীবন এমন হ্যাংলামি করে? গোটা ব্যাপারটাই দূরদর্শীদৃষ্টিতে মূঢ়তার চরম নয় কি?

কিংবা সেই বিখ্যাত গল্পটির (ভগবান সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অপেক্ষমাণ) কথা স্মরণ করা যেতে পারে যাতে সরাইখানায় রাত্রিযাপনকারী নির্দোষ এক বণিক আসকেনভ মিথ্যা হত্যার অভিযোগে ধৃত হয়ে সারা জীবন জেলে পচে মরলো। কয়েদীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে খাটতে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো. মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেল। (যাত্রায় বেরবার আগে তার স্ত্রী এমনতর দুঃস্বপ্নই দেখেছিল এবং তদ্দরুণ স্বামীকে যাত্রা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেয়েছিল। স্বামী স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে পথে বেরিয়েছিল। এইখানটায় প্রাচ্য কুসংস্কারের খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অথবা এটা ভবিষ্যত ঘটনার পূর্বাভাস জানাবার, সোজা কথায় গল্প জমাবার, একটা কৌশল হতে পারে। —লেখক।)

ঘটনাচক্রে দীর্ঘদিন বাদে জেলের অভ্যন্তরে কয়েদী হয়ে এলো এক ব্যক্তি (মকর) যে বণিকের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। এ সেই ব্যক্তি, যে সরাইখানায় এক পান্থকে হত্যা করে তার টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়েছিল এবং যাবার আগে রক্তাক্ত ছোরাটি বণিকের বোঁচকার মধ্যে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল। তারই ফলে বণিকের এই জীবনভোর লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। সহবন্দী বণিকের সঙ্গে খুনে কয়েদীর কালক্রমে আলাপপরিচয় হলো। একদিন কথায় কথায় দুর্বৃত্ত খুনে আন্তরিক অনুশোচনার বশে বণিকের কাছে তার বিগত জীবনের কৃত সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলো এবং সেই সূত্রে সরাইখানার সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী ঘটনার ধারাও বিবৃত করতে ভুললো না। লোকটা কিন্তু তখনও জানে না যে, নিজে হত্যাপরাধ থেকে মুক্ত থাকবার তাগিদে যার বোঁচকার মধ্যে সে রক্তমাখা ছোরা গুঁজে দিয়ে এসেছিল এ সেই বণিক, হত্যা না করেও হত্যাপরাধে বন্দী হয়ে আজ বহু বৎসর যাবৎ যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে খুনী আসামীর শাস্তি ভোগ করছে।

আসকেনভ সমস্ত ঘটনা এক মনে শুনলো কিন্তু তার কোন ভাবান্তর লক্ষিত হলো না। প্রথমটায় লোকটার প্রতি তার অন্তর দুর্নিবার ক্রোধে ছেয়ে গিয়েছিল,

প্রতিহিংসার আগুন হৃদয়ে চকিতে জ্বলে উঠেছিল। এই লোকটার জন্যই তার জীবনে এত কষ্ট, অকারণ এই দণ্ডভোগ। ইতিমধ্যে সে তার স্ত্রীপুত্রকন্যা হারিয়েছে, তার গৃহ নষ্ট হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ আশাভরসা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে গেছে। এই লোকটাই তার সব কিছু দুর্গতির জন্য দায়ী। এবার সে তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে, সুতরাং অমনিতে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে কী হবে এর উপর প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করে। তার দ্বারা সে তার লুপ্ত সুখশান্তি ফিরে পাবে না বরং এই অনুতপ্ত লোকটির দুঃখ বাড়বে। পাপের অকপট স্বীকৃতিতে যে মর্মবেদনার অশ্রু ঝরে পড়লো তাইতেই মকরের সমস্ত পাপের গ্লানি ধুয়েমুছে যাক, পাপের দণ্ড বিধানের ভার তার উপরে কেউ ন্যস্ত করেনি। এ ছাড়াও দীর্ঘ-কালীন কারাভোগের অবসরে তার মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল। সে তার সমগ্র চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করে ঈশ্বরভক্তির মধ্যেই তার প্রাণের শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। জীবনে সে যত দুর্দশাই ভোগ করুক, তার আর কারুর বিরুদ্ধে, কিছুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, বাকী দিনগুলি ঈশ্বরের ধ্যানে কাটিয়ে দিতে পারলেই সে তৃপ্ত। সে মনে মনে লোকটিকে ক্ষমা করলো শুধু তাই নয়, সে মকরকে নিশ্চিত শাস্তির হাত থেকেও বাঁচালো তার জেল থেকে পালানোর চেষ্টার অপরাধ কর্তৃপক্ষের কাছে শত জেরাতেও ফাঁস না করে। আসকেনভের মুখের একটি কথাতেই মকরের মৃত্যুদণ্ড হতে পারতো কিন্তু আসকেনভ ওই পথেই গেল না। আসকেনভের ক্ষমার কোন তুলনা নেই। জেলেই আসকেনভের মৃত্যু হলো।

এই গল্পে একদিকে যেমন টলস্টয়ের গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস সূচিত হয়েছে অন্যদিকে 'ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ' এই শ্রেয়োবোধের মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। আগাগোড়া রচনাটি খ্রীশ্চিয়ান করুণার ধারণায় পরিপূর্ণ। টলস্টয়ের বিশেষ জীবন দর্শন এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

টুয়েন্টি-থ্রি টেলস-এর গল্পগুলির অতিশয় সাদামাঠা বিবৃতি ও নীতির প্রাধান্য দেখে রুশ দেশেরই কিছু কিছু সমালোচকের মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, টলস্টয় এসব রচনায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জটিল শিল্পীসত্তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শিশু-সাহিত্যোচিত অতিসারল্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তার ফলে তাঁর শিল্প-শক্তির যথাযথ প্রকাশ তিনি নিজহস্তেই খণ্ডন করেছেন মারাত্মক ভাবে। কেউ কেউ এসব গল্পে টলস্টয়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের সহযাত্রী বন্ধু চার্টকভের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপজনিত প্রভাব আবিষ্কার করে ক্ষুণ্ণ বোধ করেছেন। কিন্তু এর উত্তরে বলা যায় টলস্টয় তাঁর জীবনের শেষ পর্বে পরিণত প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি হিসাবে সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই এইসব গল্প লিখেছিলেন এবং সেগুলিতে জটিলতা বর্জন করেছিলেন।

গল্পগুলির সারল্য কষ্টকৃত নয়। এরকম গল্প লেখবার জন্য যে তিনি ভিতরে ভিতরে অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন হোয়াট ইজ আর্ট? বইয়ের একটি অনুচ্ছেদে তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে টলস্টয় লিখেছেন —"ভবিষ্যতের শিল্পী নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করবেন যে, উপকথা ও চিত্তস্পর্শী গান রচনা করা, মনোহারী কোন ঘুমপাড়ানি ছড়া বা ধাঁধা বানানো, কৌতুকপ্রদ শ্লেষ বা ব্যঙ্গ উদ্ভাবন করা, অথবা বেশ কয়েক প্রজন্মে বিধৃত লক্ষ লক্ষ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের মনোরঞ্জনকারী কোন গল্প বা নক্সা তৈরী করতে পারা—এ সব কাজ একটি উপন্যাস বা সিম্ফোনি রচনা করার চেয়ে কিংবা একটি ছবি আঁকার চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক গুণ বেশী দরকারী ও সমধিক ফলদায়ক। উপন্যাস বা সিম্ফোনি সঙ্গীত কিংবা চিত্রাঙ্কন দ্বারা ধনীশ্রেণীর একাংশের চিত্তবিনোদন করা যায়, তা-ও কিয়ৎকালের জন্য মাত্র। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সবের প্রভাব চির-কালের জন্য মুছে যায়। সর্বসাধারণের অধিগম্য সহজতম আবেগ অনুভূতির এই যে শিল্প, এর এলাকা সুবিশাল এবং এই এলাকাটি এখনও পর্যন্ত প্রায় অনাবিষ্কৃত রয়েছে।"

টলস্টয়ের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ক্ষুরধার বাস্তবতা। নাটকগুলির অন্যতম মূল উপজীব্য যৌনতা। যৌনতার চিত্রণে তিনি কোথাও শুচিবাইকে সত্যনিষ্ঠার উপরে স্থান দেননি, যদিও এ কথা সুবিদিত যে টলস্টয় একজন গভীর নীতিবাদী, খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার আদর্শে বিশ্বাসী লেখক। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসগত বিশুদ্ধিবাদ (পিউরিটানিজম) কোথাও তাঁর শিল্পগত বাস্তবতার বাধক হয়নি। নাট্য রচনায় আরও বেশী তদ্‌গত হতে পারলে তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হতে পারতেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

টলস্টয়ের সামগ্রিক সাহিত্যের মূল্যায়ণে যে কথাটা সব আগে মনে হয় তা হলো তাঁর দুর্ধর্ষ সৃষ্টিশীলতা ও কম বেশী ত্রুটিহীন শিল্পবোধ। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এই সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পানুভূতি তাঁকে ত্যাগ করেনি। উত্তরকালে তিনি যখন নিছক শিল্পীর ভূমিকা পরিহার করে দার্শনিক ও প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তখনও দেখা যায় তাঁর সৃষ্টিধর্মিতার শক্তির ফুরিয়ে-না যাওয়া সঞ্চয়ের বিপুলতা। ক্ষয়হীন তাঁর প্রাণশক্তি, অজেয় তাঁর সৃষ্টির স্ফূর্তি। রুশ সাহিত্যের পিতামহকল্প এই পুরুষের যেন শেষ বয়সেও শ্রান্তি ক্লান্তি নেই পাঠকসমাজকে নিত্য নতুন সৃষ্টির উপহার দানে বিমোহিত করে তোলায়।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পী হিসাবে বাস্তবতাবাদের আদর্শের প্রতি তাঁর অকম্পিত আনুগত্য। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, তবে একটা বিষয় এখানে যোগ করা দরকার। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে টলস্টয় নিকষ ভাববাদী ঘরানার লেখক হলেও (তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস, যীশুভক্তি, অহিংসা প্রীতি, যৌন সংরক্ষণশীলতা ইত্যাদি স্মরণীয়) শিল্পী হিসাবে তিনি একজন দ্বিধাহীন বাস্তববাদী। তাঁর আদর্শবাদ তাঁর বাস্তববাদের পথে কোথাও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। যেই কালে তিনি জানিয়ে-শুনিয়ে ধর্মশিক্ষক তথা নীতি-শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তখনও দেখা যায় তাঁর বাস্তববাদ অমলিন রয়েছে, শিল্পের সত্যনিষ্ঠার দাবী পূরণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ এক অসামান্য শক্তি।

শিল্পচিন্তা

মহামতি লিও টলস্টয়ের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় ধারণা ও চিন্তা তাঁর সময়ের মানদণ্ডে তো বটেই আজকের যুগের মানদণ্ডেও যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর। চিন্তার এই অগ্রসরতা এসেছে চিন্তার মৌলিকতা থেকে। মৌলিকতা বা স্বকীয়তা এতই চমকপ্রদ ও অপ্রত্যাশিত যে, শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর যুগের নিরিখে একজন অগ্রগামী চিন্তানায়ক বলাই যথেষ্ট নয়, বলা উচিত তিনি তাঁর যুগের তুলনায় অনেক, অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। টলস্টয় যখন তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় ভাবনা-ধারণাগুলিকে রূপ দেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেটা বিগত শতকের শেষ দশকের কথা। তার পর প্রায় আশি-পঁচাশি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়-সীমার সুযোগে আমরা একালের লোকেরা টলস্টয়ের থেকে ভিন্নতর কিংবা নতুনতর কিংবা অধিকতর বৈপ্লবিক কথা কিছু বলতে পেরেছি দাবি করতে পারলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারতুম কিন্তু তার পথ নেই। সত্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে টলস্টয় যেখানে এসে থেমেছিলেন সেখান থেকে আমরা এগোতে তো পারিইনি বরং কোন কোন দিক দিয়ে পিছিয়েছি।

এ কথার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করছি। যে 'আর্ট-ফর-আর্টস-সেক' বা কলাকৈবল্যবাদী শিল্পতত্ত্বকে টলস্টয় সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মতবাদ জ্ঞানে ষোল-আনা বর্জন করেছিলেন তা আজও আমাদের লেখকশ্রেণীর সকলের না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মনে মোহ বিস্তার করে রয়েছে। শিল্পের 'ফর্ম' বা রূপরীতিকে যথোচিত পরিমাণে গুরুত্ব দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিল্পের 'কনটেণ্ট' বা বিষয়বস্তুকেও তুল্য পরিমাণেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন, এমনকি তাঁর মূল্যবোধের মানদণ্ডে রূপ অপেক্ষা বিষয়ের মর্যাদা বেশী ছিল এমন কথা বললেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না। অথচ আজও আমরা শিল্পের এলাকায় 'রূপ' 'রূপ' করেই পাগল, বিষয়ের গুরুত্বের বোধ এখনও আমাদের মনে যথোচিত পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হয় না।

টলস্টয় জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নৈতিকতা বা 'মরালিটি'কে শিল্পের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে মনে করতেন, আমরা এখনও ফ্রান্স ইংলণ্ড ও সাধারণভাবে পশ্চিম ইউরোপের উনিশশতকীয় শিল্পাদর্শের প্রভাবে নীতির নামে আঁতকে উঠি এবং ভুল করে ভাবি নীতি মানেই শুচিবাই তথা বেত্রদণ্ড-

পাণি স্কুলমাস্টারের রক্তচক্ষু আস্ফালন। নীতি কথাটার যে একটা উদারতম মানবকল্যাণমুখী ব্যঞ্জনা থাকতে পারে সে কথা আমাদের আদপে খেয়ালই হয় না। সৌন্দর্যের সঙ্গে উদারতম নীতির যে কিছুমাত্র বিরোধ নেই বরং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সম্ভব অমর শিল্পস্রষ্টা টলস্টয় তাঁর নিজের রচনাবলীর মধ্যেই তার অসংখ্য প্রমাণ রেখে গেছেন বারে বারে, বিশেষ তাঁর শেষ বয়সের রচনাবলী এক্ষেত্রে দিক্‌চিহ্নের কাজ করতে পারে। তা সত্ত্বেও নীতিবাদ সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত অবিশ্বাস কিছুতেই ঘুচতে চায় না, নীতিকে আমরা সৌন্দর্যের পরিপন্থী রূপে ভাবতেই সচরাচর অভ্যস্ত। আমাদের মধ্যে নীতিবাদ সম্পর্কে এই খুঁতখুঁতে বাই এসেছে জনসংযোগরহিত এবং একান্তরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী তথা আত্মকেন্দ্রিক ফরাসী শিল্পাদর্শের প্রভাবে, যে-শিল্পাদর্শকে টলস্টয় তাঁর বিভিন্ন লেখায় তুলোধুনো করে ছেড়েছেন শানিত ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে।

তার উপরেও কথা আছে। আমরা তো মাত্র কিছু কাল যাবৎ ওই যাকে বলে 'অপসংস্কৃতি' তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু টলস্টয় আজ থেকে একশো বছর আগেই রুশ শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অপদেবতার দৌরাত্ম্যের ঘোরতর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে সে বিষয়ে সজাগ করে দিয়েছিলেন। রুশ সঙ্গীতে নাট্যে অভিনয়ে নৃত্যকলায় সাহিত্যে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সমাজ-ব্যবহারে অপসংস্কৃতির বিষ প্রবেশ করে কেমন করে জনসাধারণের সুস্থ চেতনাকে কলুষিত করে তুলেছে এবং তাদের বিপথগামী করছে সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' নামক প্রসিদ্ধ শিল্প সম্বন্ধীয় বইটিতে। চিত্রটি মোটেই মনগড়া নয়—ব্যাপক উদ্ধৃতিযোগে স্পষ্টীকৃত। অপসংস্কৃতি সঞ্জাত রুশ সাহিত্যের এই বিপথগামিতার মূলে ছিল ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের 'নেচারেলিস্ট' লেখক (যথা, স্তাঁধাল, ফ্লবেয়র, মোপাসাঁ, জোলা প্রমুখ) এবং 'সিম্বলিস্ট' বা প্রতীক-বাদী কবি (যথা, বোদলেয়ার, মালার্মে, ভারলেন প্রমুখ) বৃন্দ। আমাদের যেমন ইংরেজী সাহিত্য, তেমনি জারশাসিত বিপ্লবপূর্ব রুশ সাহিত্যের লেখকদের একটা বড় অংশের মূল প্রেরণার উৎস ছিল ফরাসী সাহিত্য। প্যারিস ছিল একাধিক রুশ লেখকের মক্কা স্বরূপ। টলস্টয়ের বন্ধু প্রসিদ্ধ রুশ কথাসাহিত্যিক টুর্গেনিভ তো ফরাসী শিল্পীদের সঙ্গে কাঁধ-ঘেঁষাঘেষি আর ফরাসী কথাকারদের সঙ্গে গা-শোঁকাশুঁকি করবার মানসে স্বদেশ ছেড়ে দীর্ঘদিন প্যারিসে গিয়েই আস্তানা গেড়েছিলেন। টলস্টয় নিজেও ফরাসী সাহিত্যের রূপরীতির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সজাগ সমালোচক সত্তা

কখনও তাঁকে বেচাল হতে দেয়নি। তিনি রুশ শিল্প সংস্কৃতির উপর অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবার বেলায় পূর্বোক্ত ফরাসী প্রকৃতিবাদী আর প্রতীকবাদী লেখকদের মোটেই ছেড়ে কথা কননি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকরূপে যাঁর প্রসিদ্ধি, এমনকি একাধিক সমালোচকের বিচারে যিনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকরূপে বন্দিত, সেই গী দ্য মোপাসাঁর রচনাকে তিনি কী কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন তার পরিচয় জানতে হলে তাঁর হোয়াট ইজ আর্ট ? বইটি পড়া প্রয়োজন। অথচ টলস্টয় স্বয়ং মোপাসাঁর একজন অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও বিষয়বস্তুর নির্বাচনে মোপাসাঁর অত্যধিক যৌনাসক্তি এবং নারীকে কেবলমাত্র ভোগলালসার পরিতৃপ্তির উপকরণ রূপে আঁকবার প্রবণতা, সর্বোপরি তাঁর শিল্পকর্মের কমবেশী উদ্দেশ্যহীনতা টলস্টয় আদপেই বরদাস্ত করতে পারেননি। নির্মমভাবে তিনি এগুলির বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কার জানিয়েছেন।

অন্য দিকে ফরাসী দুর্বোধ কবিদেরও তিনি একহাত নিয়েছেন। আমাদের বাংলা ভাষার আধুনিক কবিকুলের ভিতর একাধিক জন আছেন যাঁদের বোদলেয়ারের নাম শোনামাত্র ভক্তির আতিশয্যে চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম হয়। তাঁর 'ফ্লুরস দু মাল' বা 'পাপের ফুল' কাব্যগ্রন্থখানাকে তাঁরা মাথায় রেখেই সন্তুষ্ট হন না, হৃদয়ে রাখতে পারলে বর্তে যান। সেই আধুনিক কবিকুল বন্দিত বোদলেয়ারের কাব্য সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে টলস্টয় তাঁর সম্পর্কে চরমতম নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। ভার্লেনের কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর জঘন্য পাপময় জীবনযাত্রার ছকটিকে মিলাতে গিয়ে টলস্টয় বিমূঢ় বোধ করেছেন এবং ভার্লেনকে তিরস্কার করবার ভাষা খুঁজে পাননি। দুজনেরই দুর্বোধ্যতাকে তাঁদের শিল্পের একটা বড় ত্রুটি বলে মনে করেছেন তিনি।

শিল্পীরা কেন জীবনের মঙ্গল অপেক্ষা তথাকথিত সৌন্দর্যকে বড় মনে করেন এই প্রশ্নেই টলস্টয়ের বিমূঢ়তা। শিল্পকে কেন এত বড় করে দেখা হবে যাতে সে জীবনকেও ছাড়িয়ে যায় ? শিল্পের দাবি কি জীবনের দাবি অপেক্ষা বড় ? যে-সংস্কৃতির পরিকল্পনায় শিল্প এতই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে যে তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন ধর্তব্য বলে গণ্য হয় না, শিল্পীকে সমাজ-নিরপেক্ষ একটি অসামান্য জীব কল্পনা করে তাঁর উপর বিধাতার গুণ আরোপ করা হয়—সেই সংস্কৃতির ছিদ্রপথেই অপসংস্কৃতির উদ্ভব, আর এই অপসংস্কৃতিকেই টলস্টয় নিন্দা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। একশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও কি আমরা শিল্পচিন্তার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে টলস্টয় অপেক্ষা বেশী মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছি বলে দাবি করতে পারি ? অবশ্যই নয়।

শিল্প সম্বন্ধে টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এতই মৌলিক যে তিনি অমর নাট্যস্রষ্টা ও কবি শেক্সপীয়রের রচনাবলী সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করতে পিছু হটেননি। তিনি শেক্সপীয়রের নাটকে খুনের কোলাহলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অন শেক্সপীয়র অ্যাণ্ড দি ড্রামা' গ্রন্থে এই সমালোচনা বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত। শেক্সপীরীয় নাটকে হিংসা ও ক্রূরতার আতিশয্য শিল্পের মূলেই আঘাত করেছে বলে তিনি মনে করেন। সৌন্দর্য ও কল্যাণের এ পরিপন্থী বলে তাঁর ধারণা।

টলস্টয়ের শিল্প সম্বন্ধীয় মতামতকে স্কুলমাস্টারী মনোভঙ্গী প্রসূত শুচিতার বাতিক মনে করলে আমরা চরম ভুল করবো। তাঁর প্রতিভার প্রতি এর চেয়ে অবিচার আর কিছু হতে পারে না। ভুললে চলবে না যে, টলস্টয় রুশ সাহিত্যের এক অগ্রগণ্য স্রষ্টা—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম, কারও কারও মতে শ্রেষ্ঠ। ডি. এইচ. লরেন্স মনে করতেন বিশ্ব সাহিত্যের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে টলস্টয়ের স্থান সকলের উপরে। যে অমর স্রষ্টা দুনিয়াকে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', 'আনা কারেনিনা', 'রেসারেকশন'-এর মত অবিস্মরণীয় উপন্যাসাবলী, 'দি লাইট শাইনস ইন ডার্কনেস' ও 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস'-এর মত নাটক এবং শেষ বয়সের 'টুয়েন্টি-থ্রি টেলস'-এর গল্পগুলির মত বাইবেলীয় প্যারাবল সদৃশ সরল সহজ আবেদনযুক্ত অনবদ্য ছোটগল্পসকল উপহার দিয়েছিলেন, তাঁকে একজন নিছক শুচিবাইগ্রস্ত মতবাদের লেখক বলে উড়িয়ে দিতে চাওয়ার চেষ্টা বুকের পাটার পরিচায়ক হতে পারে কিন্তু ওই বুকের পাটার বড়াই হাস্যেরই শুধু উদ্রেক করবে।

কথাসাহিত্যে যিনি শিল্প সৃষ্টির উত্তুঙ্গ চূড়া স্পর্শ করেছিলেন তাঁর অসামান্য প্রতিভার বলে, তিনি শুচিবাইচালিত লেখক হবেন না তো আর কে হবেন? এই ধরনের কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কোন ধারণা নেই বুদ্ধি আর মতামতের জগৎ নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির জগতেই টলস্টয়ের সম্মানের আসন কত ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাঁর ওয়ার অ্যাণ্ড পীসকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বরূপ গণ্য করা হয়, আনা কারেনিনাকে মনে করা হয় ত্রিকোণ প্রেমের বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত কাহিনীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাহিনী (আমাদের সাহিত্যের 'ঘরে-বাইরে' আর 'গৃহদাহ' একই বিষয়ভিত্তিক রচনা হয়েও আনা কারেনিনার তুলনায় নিতান্ত নিষ্প্রভ); রেসারেকশন বা পুনর্জন্ম উপন্যাসটিকে সমালোচকরা মনে করেন টলস্টয়ের শিল্পজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সে এই কারণে যে, এই উপন্যাস নিছক শিল্প ও

সৌন্দর্যের স্তরে আবদ্ধ না থেকে ওই সীমা ছাড়িয়ে সুগভীর মানবকরুণার স্তরে প্রবেশ করেছে এবং আধুনিককালীন মানুষের পক্ষে অনুধাবনীয় অত্যুৎকৃষ্ট কতকগুলি শ্রেয়োবোধ পাঠক মনে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করেছে। ভোগীর ভোগলালসার প্রতি ধিক্কার আর অন্যায় কৃতকর্মের জন্য নিবিড় অনুশোচনা সঞ্জাত অনুতাপের অশ্রুজলে এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সিক্ত। সেই সঙ্গে আছে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি অপরিমেয় সহানুভূতির প্রকাশ এবং নির্যাতক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

সেই টলস্টয় যখন পরিণত বয়সে পৌছে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির আদর্শকে একপাশে সরিয়ে রেখে নীতিবাদকে সুউচ্চ স্থান দেন এবং বলেন যে শিল্পসৃষ্টি সৌন্দর্যের ধারণার দ্বারা সংক্রামিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলের আদর্শের দ্বারাও সমপরিমাণে প্রভাবিত হওয়া উচিত, এবং সেই শিল্পই শ্রেষ্ঠ শিল্প এবং সার্বভৌম শিল্পের (ইউনিভার্সাল আর্ট) লক্ষণ যুক্ত যা জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত এবং বিশেষভাবে জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভেবে রচিত—বুঝতে হবে দীর্ঘদিনের ভাবনাচিন্তা সাহিত্য চর্চার অভিজ্ঞতা আত্মসমীক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথপরিক্রমা করে করে তবেই তিনি ওই জাতীয় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের কিনারায় এসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। রাতারাতি তিনি হঠাৎ নীতিবাদের উপাসক হয়ে ওঠেননি কিংবা সাহিত্যের অনুষঙ্গে সমাজ-মঙ্গলের (সোশ্যাল গুড) এমন জোরালো প্রবক্তা হয়ে ওঠেননি। এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার আগে আত্মপরীক্ষা ও অন্তর্সংঘাতের দীর্ঘ স্তর-পরম্পরা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। যে-দেহবাদ ও যৌনতাকে তিনি হোয়াট ইজ আর্ট? বই লেখবার সময়ে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, তিনি নিজেও কিছু সেই দেহবাদের চর্চা কম করেননি তাঁর লেখায় একটা সময়ে। তাঁর 'ক্রুশজার সোনাটা', 'ডেভিল' প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু যৌন প্রেম নিয়ে। কিন্তু এজাতীয় বিষয়ের অসারতা ও অনিষ্টকারিতা তিনি পরে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিন্দায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

সামন্তবাদী সমাজেই হোক আর পুঁজিবাদী সমাজেই হোক অলস বিলাসী ধনী সমাজের লোকেদের মনোরঞ্জনের একটা প্রধান উপকরণ যৌনতা। টলস্টয় নিজে ছিলেন সামন্ত সমাজের একজন জাঁদরেল প্রতিনিধি 'কাউন্ট' উপাধিযুক্ত প্রকাণ্ড ভূস্বামী, অলস ধনী ভোগী সমাজের লোকেরা সাহিত্যে কী চায়, শিল্পোপভোগের ক্ষেত্রে কী তাঁদের রুচি-পছন্দ প্রবণতা তার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল, কেননা ওই শ্রেণী সমাজেই তাঁর জন্ম এবং যৌবনে তিনি নিজেও

বিলাসভোগ চটুল জীবনরঙ্গ কিছু কম করেননি। কিন্তু রুশীয় অভিজাত-তন্ত্রের একজন পরাক্রান্ত প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ সংবেদনশীল পুরুষ এবং নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসা আর সতত আত্ম-সমালোচনায় উন্মুখ সেই কারণে আকৈশোর ভোগবিলাসের আবহে বিচরণ করেও ভোগবিলাসের ফাঁকি ও মেকি ধরে ফেলতে পেরেছিলেন সহজেই এবং পরবর্তীকালীন রচনাদিতে ওই অশ্রদ্ধেয় সংস্কারের উপর চরম আঘাত হেনে-ছিলেন। অপরিসীম প্রতিভাধর লেখক হওয়া সত্ত্বেও মোপাসাঁকে তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন তাঁর আত্যন্তিক যৌনতা ও নারীমনস্কতার জন্য, প্রকৃতিবাদী লেখক জোলার অতিবাস্তবতা তাঁর বরদাস্ত হয়নি। এসব ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বেলায় টলস্টয়ের শিল্পবিচারের একটিই ছিল মাপকাঠি : জীবনের গভীরতার বোধে কোন্ শিল্প কতটা পরিমাণ জারিত এবং ওই জীবনের গভীরতার বোধ শ্রমজীবী জনসাধারণের মঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে অথবা বাদ দিয়ে, তার বিচার।

স্পষ্টই মানদণ্ডটি অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সীরিয়াসমনা আদর্শবাদী লেখক টলস্টয়ের কাছে এর চেয়ে কম সাধ্যায়ত্ত মানদণ্ড কেমন করেই বা গ্রাহ্য হতে পারতো? জীবনের গভীরত্বের বোধ বর্জিত শিল্প রচনা বা সাহিত্য সৃষ্টি টলস্টয়ের মত মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করবে এ কথা কী করে আমরা ভাবতে পারি? টলস্টয় পর্বে পর্বে আত্মবিকশিত হয়েছেন, জীবন জিজ্ঞাসায় ও আত্মজ্ঞানের তৃষ্ণায় তিনি সতত ভরপুর ছিলেন। নিজের ভুলত্রুটি অন্যায় আর পাপ একজন খাঁটি আত্মসমালোচকের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে আপনাকে নিরন্তর সংশোধনের কাজে নিরত ছিলেন। এইভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের গোত্র বদল হয়েছে এবং উত্তরকালে একজন ঋষিপ্রতিম মানুষরূপে সর্বত্র পূজিত হয়েছেন তিনি। তাঁকে বলা হতো 'বিশ্বের জাগ্রত বিবেক' (দি লিভিং কনস্যান্স অব দি ওয়ার্ল্ড)। ওই অভিধা তাঁর উপরে অকারণে অর্পিত হয়নি। পরিণত জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছক প্রথম বয়সের তুলনায় এতটাই অবিশ্বাস্য রকম রূপান্তরিত হয়েছিল যে তাঁর উপর আর্ষত্ব আরোপ করে লোকের শ্রদ্ধার বোধ তৃপ্তি পেত। দেশবিদেশ থেকে পরামর্শ চেয়ে চিঠি আসার বিরাম ছিল না। লোকে তাঁর কাছে শোকে সান্ত্বনা, সংকটে পথের দিশা, অন্ধকারে আলো লাভের আশায় আসতো, হয়তো এও এক রকমের বীরপূজা।

সুতরাং টলস্টয়ের শিল্পভাবনার ক্রমিক রূপান্তর কিংবা জীবনের পরিণত অধ্যায়ে গভীর নীতিবোধের দ্বারা তাঁর সংক্রমণ তাঁর জীবনসাধনারই এক

অচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ। এইভাবেই তাঁকে আমাদের বুঝতে হবে। আর এই জীবনসাধনার মূলে ছিল মানুষ কেন বাঁচে, জীবনের কী অর্থ, কী হলে মানুষ সার্থকভাবে জীবন ধারণ করতে পারে এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের ক্রমাগত সদুত্তর অন্বেষণ। এই ক্রিয়ায় অবিরত ব্যাপৃত থাকার ব্যায়াম এবং লব্ধ সদুত্তর সমূহের আলোকে আপনাকে অনবরত শোধিত ও পরিবর্তিত করবার চেষ্টাই টলস্টয়ের উত্তরকালীন তথাকথিত ঋষিকল্প গোত্রান্তরণের কারণ।

মহিমান্বিত আলোকদীপ্ত সেই প্রকাশের পশ্চাৎপটের সঙ্গে জড়িত কিছু পূর্বকথা আছে। পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও সেটা সূত্রাকারে এখানে আলোচ্য।

টলস্টয় প্রথম জীবনে অতিশয় ভোগী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। যৌবনের অশান্ততা ও চাঞ্চল্যের একটা প্রধান কারণ ছিল বিত্তস্বাচ্ছল্য, সুপ্রচুর অবসরের আলস্য ও রুশ সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের পরিবেশ। ইয়াসনায়া পলিয়ানার জমিদার সন্তানের ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির উপকরণ না চাইতেই হাতের কাছে মিলত তাইতে দুর্দান্ততা আরও বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষা গৃহে ফরাসী গভর্নেসদের কাছে এবং পরে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকেন এবং ককেশাস ও ক্রিমিয়া অঞ্চলের কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। সেই সঙ্গে প্রবৃত্তির উদ্দামতা আর বন্যতার জন্যও কম কুখ্যাতি অর্জন করেননি। কিন্তু টলস্টয়ের চরিত্রের এই এক বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর মত্ততা ও আত্ম-পরীক্ষা বরাবর পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। যে সময়ে তিনি জুয়ার টেবিলে বসে অপরিমিত অর্থ এক লহমায় উপার্জন করছেন বা ফুঁকে দিচ্ছেন, কিংবা পানালয়ে অথবা আনুষঙ্গিক আর কোন আলয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত করে ছাড়ছেন, সেই সময়েই তাঁর ভিতরকার আর এক সত্তা তাঁর কানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তাঁকে যেন সময় থাকতে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলেছে। ভোগাকাঙ্ক্ষা আর সংযমনিবৃত্তির এই টানাপোড়েন তাঁর অস্তিত্বকে নিয়ত অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, বিব্রত করে রেখেছে, যন্ত্রণাময় করে তুলেছে তাঁর বাঁচার প্রতিটি পদক্ষেপকে পথের বাঁকে বাঁকে সংশয়ের কাঁটা ছড়িয়ে, আনন্দকে করেছে তিক্ত অমৃতের পাত্রে তীব্র অনুশোচনার হলাহল মিশিয়ে; তবু এমনই দুরতিক্রম্য তাঁর নিয়তি যে, এই যন্ত্রণার কবল থেকে তাঁর নিস্তার ছিল না মুহূর্তেকের জন্য। তাঁর সহজাত স্বভাবই তাঁকে অন্তর্দ্বন্দ্বে সতত মথিত করে রেখেছে।

কিন্তু এই অস্থিরতা, অশান্ততা, যন্ত্রণাকাতরতা যদি একটা অভিশাপ হয় তবে ওই অভিশাপই টলস্টয়ের জীবনে অপরিসীম আশীর্বাদের কারক হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেননা এই অভিশাপের হাত ধরেই টলস্টয়ের জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাকে আমরা বলেছি টলস্টয়ের সত্তার গোত্রান্তরণ বা মৌলিক রূপান্তর। এই অস্থিরতা আর চিত্তক্লেশের নিরন্তর পীড়নই তাঁকে বদলে দিয়েছিল—তাঁর ব্যক্তিত্বের আদল সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে চালিত করেছিল।

টলস্টয় যখন সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত তখনই তিনি স্বীয় জীবনের স্খলন-পতন আর নীতিভ্রষ্টতার অকপট স্বীকারোক্তিমূলক 'চাইল্ডহুড' নামক আত্ম-জৈবনিক কাহিনীর প্রথম খণ্ড সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য পাঠান। সে লেখা প্রকাশিত হলে রুশ পাঠকসমাজে সাড়া পড়ে যায় এবং রুশীয় সাহিত্যে যে একটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছে তার চেতনায় সাহিত্যমহল আলোড়িত হয়। তৎকালীন প্রসিদ্ধ রুশকবি-সম্পাদক নেক্রাসভ তরুণ টলস্টয়কে 'রুশ সাহিত্যের পরম ভরসা' আখ্যা দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

চাইল্ডহুড গ্রন্থাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টলস্টয়ের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীর কাজের আকর্ষণ কোন সময়েই তাঁর কাছে তীব্র ছিল না, বরং মনে মনে যুদ্ধবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি ঘৃণাই পোষণ করতেন (যৌবনের উচ্ছলতার মধ্যেও বিবেকপরায়ণতার এ একটি কার্যকর প্রমাণ)। সাহিত্যে প্রাথমিক খ্যাতি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৈনিকের জীবিকায় ইস্তফা দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য লেখকের কর্মে নিয়োজিত থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গৃহে ফিরে এলেন। তখন থেকে ইয়াসনায়া পলিয়ানাই হলো তাঁর সারস্বত সাধনার স্থায়ী কেন্দ্র, বাণী তপস্যার পীঠ।

ইতোমধ্যে টলস্টয়ের মনোজীবনের ক্রমেই রূপান্তর ঘটে চললো। আস্তে আস্তে ভোগ থেকে ত্যাগের পথে তিনি একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে চলতে লাগলেন। পঁচিশ বছর বয়সে টলস্টয়ের মানসিকতা কোন্ পথ ধরে এগিয়ে চলছিল তার একটু আভাস পাওয়া যাবে নীচের উদ্ধৃতিতে। এ থেকে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্নিবেশ ক্ষমতার অসংশয় পরিচয় মিলবে। তিনি বলছেন—"যে মানুষ কেবল-মাত্র ব্যক্তিগত সুখের কামনা করে সে মন্দ; যে অন্যের অভিমতকে মূল্য দেয় সে দুর্বল; যে অপরের সুখবিধানে সচেষ্ট সে ধার্মিক; আর যে মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি সে মহৎ।" পঁচিশ বছরের যুবকের পক্ষে কী সাংঘাতিক বেমানান ও অস্বাভাবিক প্রজ্ঞাবানোচিত উক্তি! ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সেবাস্তোপোল অবরোধের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তরুণ টলস্টয় লিখলেন—

"হয় যুদ্ধ ব্যাপারটাই পাগলামি, নয়ত মানুষ যদি এই পাগলামি করে তাহলে সে মোটেই বুদ্ধিমান প্রাণী নয়।" যুদ্ধ বিমুখতার এই অঙ্কুরই পরবর্তীকালে লিখিত প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর বৃহদায়তন ব্যাপ্তির মধ্যে বনস্পতির বিশালতা লাভ করে এবং যুদ্ধবিলাসী দিগ্বিজয়ী দস্যু নেপোলিয়নের পররাজ্য-গ্রাসের মত্ততাকে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে। টলস্টয়ের বিচারে ১৮১২ সালের শীতে নেপোলীয়নীয় বাহিনী কর্তৃক রুশদেশ আক্রমণের ঘটনা এক চরম ক্রূরতা ও মূঢ়তার দৃষ্টান্ত। ঘৃণ্য যুদ্ধোন্মাদনাই ইতিহাসে অন্যায়ভাবে "বীর" বলে বন্দিত নেপোলিয়নের মধ্যে এই চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার সঞ্চার করেছিল। রাশিয়া বর্বর এই যুদ্ধ জিগীষার সমুচিত উত্তর দিয়েছিল সেনাপতি কুটুজভের নেতৃত্বে—ওয়ার অ্যাণ্ড পীস তারই উদ্দীপক কাহিনী। টলস্টয়ের চিন্তা সৈন্যবাহিনীতে থাকা কালেই কতটা পরিণতি লাভ করেছিল তার আর একটি প্রমাণ ওই বয়সেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—"যাকে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যাকে আমি তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছি, যে সুন্দর, সুন্দর ছিল এবং সুন্দর হবে, আমার সেই কাহিনীর নায়ক—সত্য।"

সত্য ও সুন্দরের প্রতি এই এককালীন অনুরাগই পরবর্তীকালে টলস্টয়ের চিন্তায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। টলস্টয়ের বয়স তখন পঞ্চাশোত্তীর্ণ। ততদিনে তিনি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (ষাটের দশক) এবং 'আনা কারেনিনা' (সত্তরের দশক) লিখে ফেলেছেন। বিশ্বসাহিত্যের দুই যুগান্তকারী উপন্যাস। খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ ও সম্মান তখন তাঁর দুয়ারে না চাইতেই বাঁধা। রুশ দেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নাম দিক-দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম বয়সে যে অস্বাচ্ছন্দ্যময় চিন্তা তাঁকে নিয়ত পীড়িত করেছে অথচ তাঁর অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার ছকে বড় রকমের কোন বদল ঘটাতে পারেনি, এবার তাঁর জীবনে এনে দিল প্রচণ্ড এক আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সংকট এবং সেই সংকটের ঘায়ে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলার উপক্রম করলো। তিনি বিহ্বল বোধ করলেন। খ্যাতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরূঢ় থেকেও তাঁর নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে হতে লাগলো। চিত্তের এই বিমূঢ় অবস্থায় তাঁর বিবেক তাঁকে পরিত্যাগ করেনি বরং আরও বেশী সজোরে আঁকড়ে ধরেছিল। টলস্টয়ের কেন জানি কেবলই অনুভব হতে লাগলো তিনি এতকাল যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা অলস ধনী বিলাসী সমাজের মনোরঞ্জনের জন্যই মুখ্যতঃ করেছেন—জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ওই সাহিত্যের কোন যোগ নেই। তাঁর অন্যান্য বই তো বটেই, এমনকি ওয়ার অ্যাণ্ড পীস আর আনা কারেনিনাও এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে.

পড়ে। সেই সাহিত্যকে তিনি মূল্য দিতে রাজী নন যে-সাহিত্য খেটে খাওয়া মেহনতী স্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা অভাব-অভিযোগের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং যার প্রকাশ সরল অনলংকৃত সহজবোধ্য নয়। ধনী শ্রেণীর চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত সাহিত্যের আর যত গুণপনাই থাকুক শুধুমাত্র এই মৌলিক ত্রুটির জন্যই তা অসার জ্ঞানে পরিত্যাজ্য। এই জাতীয় শিল্প একাধারে সংকীর্ণ গোষ্ঠীর শিল্প (একসক্লুসিভ আর্ট) এবং অবক্ষয়ী শিল্প (ডিক্যাডেন্ট আর্ট)। এমন শিল্পের রচনাকর্তৃত্ব তিনি অস্বীকার করতে পেলে বেঁচে যান। জনগণের জন্য জনগণের শিল্প রচনা না করায় যে অপরাধ হয়, তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের পথ হলো ভোগী সমাজের বিনোদনের উদ্দেশ্যে লিখিত বইসমূহের গ্রন্থকর্তৃত্ব অস্বীকার। টলস্টয় সেই অসম্ভব পথই বেছে নিতে চাইলেন।

প্রথম দর্শনে অবিশ্বাস্য টলস্টয়ের এই আত্মনিগ্রহের ব্রত। স্বেচ্ছা-আরোপিত কৃচ্ছ্রসাধনার এ এক দুশ্চর তপস্যা। কিন্তু টলস্টয় এই তপস্যাকে জয়যুক্ত করতে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ রয়্যালটির টাকা স্বয়ং গ্রহণ না করে দেশবাসীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে উদ্যত হলেন। এই প্রতিজ্ঞা অবশ্য কার্যে পরিণত করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, কেননা পরিবারের লোকদের হস্তক্ষেপে রয়্যালটির প্রাপ্য তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের অনুকূলে লিখে দিতে বাধ্য হন। এদিকে অন্তরে চলছিল প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বের মন্থন। কেন তিনি বাঁচবেন, কাদের জন্য বাঁচবেন এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তাঁর মন এক সংকট থেকে অন্য আর এক সংকটে ক্রমাগত উল্লম্ফন করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই স্বস্তি ও শান্তি মিলছিল না। শান্তির আশায় তিনি বিভিন্ন দেশের ধর্মগ্রন্থাদি গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করতে লাগলেন, ভারতীয় ধর্মগ্রন্থও পড়লেন কিন্তু ধর্মগ্রন্থ তাঁর চিত্তের অশান্ততার নিবৃত্তি ঘটাতে পারলো না। এক সময়ে জীবনে হতাশ হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবলেন। বিশ্ববাসীর অশেষ ভাগ্য তাঁর সে-সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি। এই সময়কার নিরন্তর বিক্ষোভ ও অস্থির আলোড়নের ফলেই নিছক শিল্পী সত্তা থেকে টলস্টয়ের দার্শনিক সত্তায় উত্তরণ—শিল্প-ভাবুক টলস্টয় মনীষী টলস্টয়ে রূপান্তরিত। ফলে একাধিক চিন্তামূলক বই এই পর্বে লেখা। যথা, 'হোয়াট টু ডু ?', 'দি গসপেল ইন ব্রীফ', 'দি কিংডম অব্ গড ইজ উইদিন ইউ', এবং সর্বশেষে 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' প্রভৃতি।

টলস্টয় শিল্পচর্চা থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে দর্শনচিন্তায় মন দিয়েছেন, তাতে শিল্পের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে—এই ছিল টলস্টয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেখক টুর্গেনিভের টলস্টয় সম্পর্কে অভিমত। টুর্গেনিভ এ বিষয়ে টলস্টয়কে সচেতন করতেও চেয়েছেন।

কিন্তু সাহিত্য যাঁর কাছে একটা পূর্ণাঙ্গ সাধনা তিনি শিল্পের খণ্ডিত ধারণায় তৃপ্তি পাবেন কেন? টলস্টয় শিল্পচর্চার সঙ্গে চিন্তাচর্চাও সমানে চালিয়ে যেতে লাগলেন। চিন্তাচর্চা করবার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল জীবনকে রূপান্তরিত করবার সাধনা। তাঁর জমিদারী এলাকার শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে, বিশেষ কৃষক প্রজাদের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রেরণায় টলস্টয় স্বয়ং কায়িক শ্রমের কাজ শিখলেন। কায়িক শ্রমের কাজের মধ্যে আবার জুতো সেলাইয়ের কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। টুয়েন্টি-থ্রি টেলস-এর গল্পগুলির মধ্যে হামেশা যে চর্মকারের জীবনযাত্রার ছবি দেখতে পাওয়া যায় তার মূল নিহিত আছে টলস্টয়ের চর্মকারের কাজের হাতে-কলমে-শেখা অভিজ্ঞতার মধ্যে। টলস্টয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কায়িক শ্রমের জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। এই বিশ্বাসের পিছনে বাইবেলের নীতি কথার প্রণোদনা অবশ্যই ছিল, তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভূমিকাটাও বুঝি বড় কম ছিল না।

শেষ বয়সের টলস্টয়ের জীবন খুবই অশান্তিময়। অশান্তির কারণ আদর্শ-বাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সংঘর্ষ। একদিকে টলস্টয়ের উত্তুঙ্গ মানবতার ধ্যান ও জনমুখীনতা, অন্যদিকে স্ত্রী ও সন্তানদের (একটি সন্তান বাদে) সংকীর্ণ পরিবার-কেন্দ্রিক মনোভাব ও হীন বিষয় আসক্তি। স্বার্থের ক্রমাগত ঠোকাঠুকির ফলে পারিবারিক খিটিমিটি চরমে ওঠে এবং এক সময়ে সমস্ত সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে টলস্টয়ের গৃহত্যাগ ও নিরুদ্দেশের অভিমুখে যাত্রা। এর পরিণাম কী সংঘাতিক হয়েছিল তাঁর কথা পাঠকেরা সকলেই জানেন। জীবনী অংশে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

টলস্টয় তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট?' বইতে মোপাসাঁর উপর যে প্রবন্ধটি (এটি একটি রুশ ভাষায় অনূদিত মোপাসাঁর গল্পসংকলনের ভূমিকা) সন্নিবিষ্ট করেছেন তাতে মোপাসাঁর সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে শিল্প কী হলে সত্যিকারের শিল্প লক্ষণাক্রান্ত হয় তার তিনটি সর্তের উল্লেখ করেছেন। এই সর্তত্রয় হলো : (১) গ্রন্থের বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থকারের সঠিক সম্পর্ক অর্থাৎ নৈতিক সম্পর্ক ; (২) প্রকাশের স্বচ্ছতা, অর্থাৎ লিখনরীতির সৌন্দর্য ; এবং (৩) চিত্রিতব্য বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারের স্বকীয় অনুরাগ বা বিরাগের অনুভূতি।

নির্দেশিত এই তিন সর্তের মানদণ্ডের বিচার করে টলস্টয় মোপাসাঁর সাহিত্য-কৃতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মোপাসাঁর লেখায় শেষোক্ত দুটি গুণ

বর্তমান, কিন্তু প্রথমোক্ত গুণ একেবারেই অনুপস্থিত। মোপাসাঁর যথেষ্ট প্রতিভা ছিল কিন্তু সেই প্রতিভাকে সাহিত্যে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না অথবা ধারণা থাকলেও, তিনি যে-পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করতেন এবং যে-ধরনের বন্ধুজন সংসর্গ করতেন তার কুপ্রভাবে সেই ধারণাকে তিনি তাঁর গল্পে উপন্যাসে সার্থক রূপ দিতে পারেননি। অর্থাৎ মোপাসাঁর লেখায় উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা বা সততা ছিল না। এইটাকেই টলস্টয় ঘুরিয়ে বলেছেন বিষয়ের সঙ্গে লেখকের নৈতিক সম্পর্ক বলে।

টলস্টয় মোপাসাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস ধরে ধরে বিচার করে দেখিয়েছেন নীতিবোধ বলে মোপাসাঁর সাহিত্যে কোন বস্তু নেই, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি লেখা নারীর দৈহিক রূপ ও কামজ উপভোগের বিকৃত চিত্রণে কলুষিত। ফরাসী সমাজের তদানীন্তন অবক্ষয়ী প্রভাবের দরুনই মোপাসাঁর মধ্যে এই-জাতীয় আদর্শবিকার ঘটেছিল। তিনি নারীকে ভোগের সহজলভ্য উপকরণ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি, অর্থাৎ প্রকারান্তরে পুরুষের লাম্পট্যকেই তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটাকে তিনি মোপাসাঁর রচনার একটি মারাত্মক ত্রুটি বলে অভিহিত করেছেন। মৌলিক নীতিবোধের অভাবে মোপাসাঁর অতি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকুশল লেখাও কাচিয়ে গেছে। তাঁর লিপিনৈপুণ্যের কোন তুলনা ছিল না, পাঠকমনে অনুরাগ বা বিরাগের আবেগ সঞ্চারেও তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন (এই দক্ষতাকে টলস্টয় তাঁর বইয়ের নানা জায়গায় ইনফেকশন বা সংক্রমণের ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেছেন এবং যে-লেখায় এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তাকে 'কাউণ্টারফিট' বা মেকি আখ্যা দিয়েছেন); কিন্তু হায়, তাঁর সময়কার ফরাসী সমাজের, বিশেষ ফরাসী শিল্পী সমাজের, অপকৃষ্ট রুচির প্রভাবে মোপাসাঁর সাহিত্যের এই দ্বিবিধ শিল্পগুণ তার যথোচিত মানবিক সার্থকতায় পৌছুতে পারেনি—নিম্নরুচির চড়ায় ঠেকে সে-সার্থকতা মধ্যপথেই বানচাল হয়ে গেছে।

মোপাসাঁর 'বেল আমি' উপন্যাসটি প্রসিদ্ধ কিন্তু পূর্বোক্ত ত্রয়ী সর্তের মাপকাঠিতে টলস্টয় এ বইটিকে আগাগোড়া 'কুৎসিৎ' বলে বর্ণনা করেছেন। সব কয়টি উপন্যাসের বেলাতেই টলস্টয়ের বিচার প্রায় একই রূপ ক্ষমাহীন, কেবল 'উন ভাই' (জীবন) উপন্যাসটির ক্ষেত্রে ইনি কিছু ব্যতিক্রম করেছেন কারণ এই বইটিতে টলস্টয় লেখকের উদ্দেশ্যের সততার প্রমাণ পেয়েছেন। উদ্দেশ্যের সততা অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর নীতির বোধ। একটি সরলা নিষ্পাপ বালিকা একটি কামুক পুরুষের ছলাকলায় বিভ্রমে ভুলে কী ভাবে

তলিয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে তাদের পরিবারও কেমন করে ছারেখারে গেল তার একটি বেদনাকরুণ আলেখ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। মেয়েটির ভাগ্যের বিপর্যয়ে লেখকের চিত্ত হাহাকার করে উঠেছে আর ঠিক তন্মুহূর্তেই টলস্টয় বলতে চান, মোপাসাঁ জীবন সম্পর্কে গভীর নীতিবোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এইখানেই অন্যান্য বইয়ের তুলনায় মোপাসাঁর এই বইটির উৎকর্ষ।

প্রবন্ধের সূত্রপাতেই বলেছি, টলস্টয়ের এই নীতিবোধ হৃদয়তাপবর্জিত বিশুষ্ক কোন দৃষ্টিভঙ্গী নয়, তার পঞ্জরে পঞ্জরে জীবন সম্পর্কে গভীর-গূঢ় অনুভবের ব্যঞ্জনা। সাধারণ মানুষের প্রতি ঐকান্তিক দায়িত্ববোধে এ অনুভব সমৃদ্ধ, ভোগী সমাজের চটুল জীবনদর্শন ও ততোধিক হাল্কা জীবনযাত্রার ধরনের প্রতি এ মনোভাব ঘোরতর প্রতিকূল। মোপাসাঁর সময়কার কতিপয় ফরাসী মনীষী ও ভাবুক (যথা, রেনাঁ) এই ভ্রান্তমতের প্রচার করছিলেন যে, নারীর সৌন্দর্য আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি ধারণা, তার সঙ্গে নীতির কিংবা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, রেনাঁ তাঁর একটি নাটকে (ল্য আব্বেস্‌সে দ্য জুয়ারে) এমন পিলে-চমকানো উক্তি পর্যন্ত করেছেন যে, নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাটাই নাকি আর সব বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে একটা প্রশংসার কাজ, তাতে নাকি সৌন্দর্যের দাবি পরিপূরণ হয়!

মোপাসাঁ এই জাতীয় মতবাদের আবহে বসেই তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে যে স্থূল ভোগতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর অসার রূপমোহ সঞ্জাত এই আত্মকেন্দ্রিক ভোগের উদ্গারকেই টলস্টয় কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন তাঁর মোপাসাঁ সম্পর্কিত উক্ত প্রবন্ধটিতে। সাহিত্যে জনগণের মঙ্গলের ধারণাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তাঁর এই আক্রমণ।

শিল্পকে শুধু আমোদের উপকরণ রূপে ব্যবহার করবার প্রবণতাকে টলস্টয় নিম্নরুচির প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়েছেন। যারা শুধু রসনার পরিতৃপ্তির জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, খাদ্যের পুষ্টিসংবর্ধক ক্ষমতাকে মোটে গ্রাহ্য করে না, সেইসব স্থূল ভোজনবিলাসী আর এইসব শিল্পামোদসন্ধানী মানুষদের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। শিল্প ইন্দ্রিয়কে সুড়সুড়ি দেবার জন্য নয়, জীবনের বোধকে সমৃদ্ধ করবার জন্য, জীবনের মানকে উন্নত করবার জন্য—এই ছিল টলস্টয়ের সুচিন্তিত মত। শিল্পের ইন্দ্রিয় পরি-তৃপ্তির আদর্শ ধনী তথা শাসকশ্রেণীর স্বার্থে প্রচার করা হয়েছে এবং মুখ্যতঃ তাদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনেই শুধু ওই জাতীয় শিল্পের সৃষ্টি ও প্রসার। মেহনতী

স্তরের মানুষদের আপাতশোভন ইন্দ্রিয়সুখকর সাহিত্যপাঠের না আছে অবসর না আছে ইচ্ছা। যাদের শ্রমের জীবন এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করতে হয় তাঁদের রুচি ও মানসিকতা অন্য খাতে প্রবাহিত। পরশ্রমজীবী অলসবিলাসী লোকেদেরই একচেটিয়া ভোগের বিষয় হলো ক্লেদরতির সাহিত্য। শিল্পের প্রেক্ষিতে ক্লেদরতিরই অন্য নাম অপসংস্কৃতি।

শিল্পে দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গেও টলস্টয় লিখেছেন। উত্তম যে শিল্প, অধিকাংশ লোকের কাছে তার আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজগ্রাহ্য হতে বাধ্য। শিল্প উত্তম অথচ তা এক বৃহৎসংখ্যক ভোক্তা সাধারণের কাছে সুবোধ্য নয়, টলস্টয়ের বিচারে সোনার পাথরবাটির মতই সে জিনিস অসম্ভব। মহৎ শিল্পের একটা বড় লক্ষণই হলো সারল্য। টলস্টয়ের কথায়—"মহৎ শিল্পকর্ম মহৎ এইজন্য যে সেগুলি প্রতিটি মানুষের কাছেই সহজায়ত্ত ও সুবোধ্য।" যে শিল্প মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে না বুঝতে হবে সে শিল্পের মধ্যেই মূলগত কোন ত্রুটি আছে।

এমনি আরও প্রণিধানযোগ্য মূল্যবান কথা টলস্টয় তাঁর সাহিত্যবিচারের মধ্যে রেখেছেন। একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরের মধ্যে তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তার জন্য 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' বইটি পড়াই যুক্তিযুক্ত হবে।

শিল্পকর্মের মূল্যায়ন

টলস্টয়ের রচনাবলীর দুটি ভাগ—একটি সৃষ্টিমূলক, অন্যটি জ্ঞানমূলক। সৃষ্টি-মূলক রচনার কোঠায় পড়ে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, স্মৃতিকথা লোককাহিনীর পুনর্বিন্যাস, ইত্যাদি। অন্যপক্ষে জ্ঞানমূলক রচনার কোঠায় পড়ে শিল্পচিন্তা, সাহিত্যসমালোচনা, ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, নীতিসন্দর্ভ, দর্শন, শিক্ষাতত্ত্ব, ইত্যাদি। সৃষ্টিমূলক রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, আনা কারেনিনা, রেসারেকশন, কশাকস্, দি ডেথ অব আইভান ইলিচ, ক্রুশজার সোনাটা, হাজি মুরাদ প্রভৃতি উপন্যাস; দি পাওয়ার অব ডার্কনেস, ফ্রুটস অব এনলাইটেনমেণ্ট, দি লাইট শাইনস ইন ডার্কনেস প্রভৃতি নাটক; চাইল্ডহুড, বয়হুড, মাই কনফেশন প্রভৃতি স্মৃতিকথা; এবং স্কেচেস ফ্রম সেবাস্টোপোল, টুয়েন্টি-থ্রি টেলস প্রভৃতি গল্পগুচ্ছের সংকলন। জ্ঞানবাদী রচনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হোয়াট ইজ আর্ট? নামক শিল্পসম্বন্ধীয় আলোচনার বই, তার পরেই নাম করতে পারা যায় দি গসপেল ইন ব্রীফ, হোয়াট ডু আই বিলিভ?, দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইয়ু, দি টীচিং অব ক্রাইস্ট, প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ-রাজি, অন শেকসপীয়্যর অ্যাণ্ড দি ড্রামা নামীয় নাট্যতত্ত্বের বই, সর্বশেষে এ বি সি ও প্রাইমার শীর্ষক বহুল প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকদ্বয়।

সৃষ্টিধর্মী বইগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, টলস্টয় সেগুলির যেটিতে যে বিষয়েরই আলোচনা করুন না কেন এবং তাদের মর্মগত বক্তব্য যা-ই হোক-না কেন, তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিমূলক বই-ই বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গল্পই হোক আর উপন্যাসই হোক আর নাটকই হোক কোন বইয়ের প্লটই পুরোপুরি বানিয়ে লেখা নয়, সেগুলির পিছনে সত্য ঘটনার প্রভাব আছে। বইগুলিতে শিল্পী-সুলভ কাল্পনিকতা চর্চার নিশ্চয়ই অনেকখানি অবকাশ আছে, তা নয় তো সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্য হয় না; তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, টলস্টয়ের প্রায় প্রত্যেকটি গল্প বা উপন্যাস বা নাটকের ভিত্তিমূলে আছে কোন না কোন দেখা বা শোনা ঘটনার প্রভাবের প্রণোদনা।

যেমন কশাকস্ উপন্যাসে ঘটনাবৃত্তের বিস্তারে যে-পরিবেশটিকে নির্বাচন করা হয়েছে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের তৃণভূমির কশাকস্, বাস্কির ও মোলোচান সম্প্রদায় অধ্যুষিত সুন্দর প্রাকৃতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে, টলস্টয়ের দক্ষিণাঞ্চলে পর্যটন ও জমিদারী কার্যব্যপদেশে সামারা কিংবা নিকোলসকোয়ে প্রভৃতি খামার

পরিদর্শন সূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। জমিদারীর এলাকা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় মানসে টলস্টয় কয়েকবার বাস্কিরদের অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং সৈনিকবৃত্তিতে কার্যরত থাকাকালে ক্রিমিয়াতে যাবার বা সেখান থেকে ফেরবার পথে তাঁকে এই বিশাল তৃণভূমি অধ্যুষিত কশাকদের অঞ্চল দিয়েই বার বার যাতায়াত করতে হয়েছে। উপন্যাসের পরিবেশ মনোনয়নে, ঘটনাবৃত্তের ধাঁচ-ধরন নিরূপণে এবং চরিত্রায়ণের আদল বাছাইয়ে এই সব অভিজ্ঞতা সূত্রে লব্ধ তথ্যজ্ঞান যে কশাকস্ গ্রন্থটির প্রকৃতি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে বহুল পরিমাণে নির্ধারিত করেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অন্যপক্ষে ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসের মূল উপজীব্য যে-ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সামরিক ঘটনা—নেপোলিয়ন বাহিনীর রুশ অভিযান (১৮১২)—তাতে টলস্টয়ের ঠাকুর্দা রুশপক্ষে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং টলস্টয়দের পরিবারে সেই ঘটনার স্মৃতি 'ফ্যামিলি ক্রনিকল' বা পারিবারিক ইতিবৃত্তের অংশরূপে সযত্নে রক্ষিত ছিল। এই প্রত্যক্ষ সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিল নেপোলিয়নের রুশ অভিযান সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মনোযোগী পঠন পাঠন, এমনকি যে সমস্ত জায়গায় যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্রগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করার প্রক্রিয়া পর্যন্ত উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি পর্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এছাড়া শ্রুতি স্মৃতি কিংবদন্তী কত কিছুকে যে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন তার ঠিকঠিকানা নেই।

পূর্বেই লিখেছি যে, ওয়ার অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে যে-তিনটি অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারকে তিনি যুদ্ধ ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্তরূপে চিত্রিত করেছেন—রস্টভ পরিবার, কুরাগিন পরিবার এবং বলকন্স্কি পরিবার—এ তিনটি পরিবারই টলস্টয়ের চোখে-দেখা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অঙ্গীভূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিকোলাই রস্টভকে তিনি এঁকেছেন নিজের পিতার আদলে, কাউণ্টেস মারিয়া বলকনস্কিকে এঁকেছেন নিজের মায়ের আদলে এবং কাউন্ট বেজুকভের অবৈধ সন্তান পিয়ের কুরাগিনের উন্নত ভাবজগৎকে এঁকেছেন কতকটা স্বীয় চিন্তাধারার আদলে কতকটা কল্পনাকে আশ্রয় করে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কিছুটা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, ওয়ার অ্যাণ্ড পীসের বহুল আলোচিত সৈনিকবৃত্তিধারী জ্ঞানী চরিত্র প্লাতন কারাতায়েভ বৃদ্ধ বয়সের টলস্টয়ের নিজ ভাবমূর্তির সাদৃশ্যে রচিত। শোনা যায়, নাতাশা রস্টভ চরিত্রায়ণে টলস্টয় তাঁর অন্যতমা শ্যালিকাকে প্রতিকৃতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নাতাশার চরিত্রে

যেমন; তেমনি এই তরুণীর জীবনেও নাকি প্রেমিকের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা ঘটেছিল।

এসব সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য বিষয়ে জোর করে কিছুই বলা যায় না, কেন না শিল্পীর মন যে কী ভাবে কোন্ পথে কাজ করে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনাকে যে তিনি কোন্ প্রক্রিয়ায় কী পরিমাণ মিশোল দেন, সেই গভীর-গূঢ় অ্যালকেমিসুলভ রসায়ণের তত্ত্ব নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বাইরের সাদৃশ্য দেখেই যেমন চট্ করে কোন অস্তিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়, তেমনি বাহ্য বৈসাদৃশ্য দেখেই মনে করা ঠিক নয় যে, সিদ্ধান্তটি নাস্তিবাচক হতেই হবে। আসল সত্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়।

আনা কারেনিনা উপন্যাসের অন্তিম ঘটনাটি—নায়িকা আনার রেলগাড়ীর চাকার তলায় মাথা পেতে আত্মহত্যা—একটি সত্য ঘটনার অবলম্বনে রচিত। ইয়াসনায়া পলিয়ানার অদূরস্থিত টুলা সহরের নিকটে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা নারীর জীবনে এমনতর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। টলস্টয় সেই ঘটনাটিকেই বীজাকারে গ্রহণ করে আনা কারেনিনা উপন্যাসে আরও বহু ঘটনার সংযোগে পল্লবিত করেছেন। এই পল্লবিতকরণের প্রক্রিয়ায় বাস্তব এবং কল্পনা দুয়েরই ব্যাপক উপযোগ করা হয়েছে—বাস্তব কল্পনায় মিশে গেছে, কল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আনার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মনস্তত্ত্বের অনবদ্য চিত্রণ অবশ্য টলস্টয়ের অপূর্ব শিল্পকুশলতার সাক্ষ্যবাহী।

অন্যদিকে এই উপন্যাসের লেভিন-উপাখ্যান একান্তভাবেই টলস্টয়ের ব্যক্তি-জীবনের প্রত্যক্ষ কৃষি-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। রুশ কৃষকের চাষের জমিকে কেন্দ্র করে অনুরাগ-বিরাগ আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবনা-চিন্তা সমস্যার পীড়ন শোষণ বঞ্চনা অবদমন সব এই চরিত্রটিকে আশ্রয় করে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে টলস্টয়ের নিজস্ব জীবন দর্শন—কায়িক শ্রমের শ্রেষ্ঠতার আদর্শে বিশ্বাস, কৃষির মহত্ত্বে অবিচলিত আস্থা, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাতেই আছে সত্যি-কারের সুখ এই মূল্যবোধে সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং স্বল্পে তুষ্টি—তাকেও প্রতীতিযোগ্য শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে লেভিন-কিটির আদর্শ দাম্পত্য জীবনের ছবি এঁকে। এক হিসাবে এটি নাগরিকতার উপরে গ্রামীণতার জয়জয়কারের চিত্র। জটিল জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে অজটিল সহজ জীবনযাত্রার নীতিকে তুলে ধরার প্রয়াস। টলস্টয় যে জীবনের শেষভাগে নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও আভিজাত্যের মোহ ছেড়ে পল্লীকৃষকের শ্রমনির্ভর সরল জীবনের আদর্শের একান্ত পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন সে কথা সকলেই জানেন।

রেসারেকশন উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় ঘটনা—এক পতিতা নারীর অপরাধের দায়ে আদালতে বিচার এবং বিচারে বিচারককে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত জুরীদের একজনার গভীর মর্মানুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তকরণের সিদ্ধান্ত—সত্যিকারের একটি আদালতের মামলাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই মামলাটি হয়েছিল ১৮৮৭ সালে এবং এই মামলার আসামীপক্ষের উকিল এ. এফ. কোনি সংবাদপত্রে এই মামলাটির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। তদবধি এটি রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে "কোনির বিবরণ" নামে পরিচিত হয়। টলস্টয় এই বিবরণের বিষয়ে স্বভাবতঃই অবহিত ছিলেন এবং তাকেই তিনি রেসারেকশন উপন্যাসে পরে প্রাথমিক ঘটনাবৃত্তের মর্যাদা দিয়েছিলেন. যা থেকে উপন্যাসের অনবদ্য ঘটনার ধারা কালক্রমে প্রবাহিত হয়েছিল। এছাড়া এরূপ অনুমান করবার কারণ আছে যে, রেসারেকশন উপন্যাসের মূল নায়ক চরিত্র নেখলুডভ সর্বাংশে না হলেও অন্ততঃ কতকাংশে টলস্টয়ের নিজ চরিত্রের আদলে পরিকল্পিত। এক আমোদ-সন্ধানী যুবকের অনুতাপের অশ্রুজল এবং প্রায়শ্চিত্তের পাতকাগ্নির মধ্য দিয়ে শুদ্ধ হতে হতে পরিণামে মহত্বের তীরে গিয়ে পৌছুনোর যে-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই মূল চরিত্রের মানসিক বিবর্তনের ক্রমগুলি অনুসরণ করবার ছলে, তা কি এক হিসাবে টলস্টয়ের নিজের জীবনের ছকটিকেই মনে করিয়ে দেয় না? টলস্টয়ও তো যৌবনে উদ্দাম-প্রবৃত্তি ভোগীস্বভাবের তরুণ ছিলেন, পরে যত তাঁর বয়স বেড়েছে তত তাঁর ভোগের প্রবৃত্তি শমিত হয়ে এসেছে এবং উত্তরকালে তাঁর মধ্যে পাই সংযত গম্ভীর বিচারপরায়ণ মানুষের পাপতাপের প্রতি সহানুভূতিশীল ও ক্ষমাপ্রবণ এক ঋষিপ্রতিম ভাবুককে। ভোগ থেকে ত্যাগে এই যে উত্তরণ এ জিনিস একদিনে সাধিত হয়নি; কাহিনীর নেখলুডভের মতই তাঁকে গভীর পাপ-বোধ, মর্মান্তিক অনুশোচনা ও কঠিন প্রায়শ্চিত্ত-পরম্পরার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হয়েছে এবং পরিণামে এক সময়ে তিনি উদ্ধারের কূল খুঁজে পেয়েছেন। এখানেও দেখি, বাস্তব ও কল্পনায় অপূর্ব জড়াজড়ি, মেশামেশি। কল্পনা বাস্তবের পাখায় ভর করে চলেছে, আবার বাস্তব কল্পনাকে বারে বারেই রূঢ় মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছে।

এভিন্ন, রেসারেকশন উপন্যাসে বর্ণিত ডুখোবর সম্প্রদায়ের উপর রুশ অর্থো-ডক্স চার্চের মোড়লদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনী—সে তো টলস্টয়ের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা প্রসূত এক চক্ষুরুন্মীলক নিষ্ঠুর সত্যের উদঘাটনমূলক দলিল। ডুখোবর আন্দোলনের নেতা চার্টকভ ও বিরুকভ দুজনেই ছিলেন টলস্টয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের ভাগ্যের সঙ্গে তিনি নিজ ভাগ্যকে যুক্ত করেছিলেন এবং

তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দুঃখেরও অংশীদার হয়েছিলেন। দুখোবররা তাঁদের স্বাধীন ধর্মমতের জন্য রুশদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁদের নিরাপদে স্বদেশ থেকে নিষ্ক্রমণ এবং সুদূর আমেরিকা প্রবাসে পুনর্বাসনের জন্য টলস্টয়কে বহু অর্থক্ষতি ও অন্যবিধ মূল্য স্বীকার করতে হয়েছিল। অন্যান্য মূল্যের মধ্যে পড়ে রুশ ধর্মমণ্ডলী থেকে তাঁর বহিষ্কার রূপ লাঞ্ছনা এবং সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি বরণ। এ সম্বন্ধে এই বইয়েরই অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং এখানে আর প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে গেলাম না।

এতদ্ব্যতীত ফ্যামিলি হ্যাপিনেস, দি ডেথ অব আইভান ইলিচ, ক্রুশ্জার সোনাটা, ভেভিল প্রভৃতি উপন্যাসেও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। স্ত্রীজাতির প্রতি ধিক্কার, দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতায় সংশয়, অবিবাহিত অবস্থার মহিমা কীর্তন, কৌমার্য ও ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য প্রচার, চিকিৎসাব্যবসায়ীদের কঠোর সমালোচনা, সঙ্গীতের মোহকরী ক্ষমতার অনিষ্টকারিতার প্রতি অঙ্গুলিক্ষেপ—অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে এই সব বইগুলির অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য। এইগুলিতে টলস্টয়ের ব্যক্তিগত মতের প্রতিধ্বনিই শুনতে পাওয়া যায়। বকলমে টলস্টয় এসব বইয়ে নিজেই উপস্থিত।

এদিকে ছোটগল্পগুলি বিশেষভাবেই টলস্টয়ের উদ্ভাবনী প্রতিভার বাস্তবভিত্তিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্কেচেস ফ্রম সেবাস্টোপোল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সে তো গল্পগুলির নামকরণ থেকেই উপলব্ধি হয়। সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে টলস্টয় স্বয়ং অংশ গ্রহণ ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই রেখাচিত্রগুলিকে গল্প না বলে সামরিক প্রতিবেদন (ওয়ার ডেসপ্যাচ) বললেই তাদের সঠিকতর পরিচয় দেওয়া হয়। আর সত্যি সত্যি সেগুলি ছোটগল্পের আকারে তা-ই ছিল। অন্যপক্ষে তাঁর শেষ বয়সের টুয়েন্টি-থ্রি টেলস-এর গল্পগুলি ছিল তাঁর বার্ধক্যকালীন গভীর চিন্তা ও অনুভবের রঙে ছোপানো কতকগুলি অসাধারণ আত্মপ্রতিকৃতির মুকুর। কায়িক শ্রমের পবিত্রতা, সরল ঈশ্বর বিশ্বাসের মহিমা, নিঃস্বার্থ সেবার জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন এই মতের উৎকর্ষ, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার মাহাত্ম্য, যুদ্ধোন্মাদনা ও অনিয়ন্ত্রিত মুনাফাবৃত্তির অহিতকারিতা, মদ্যপানের কুফল, ভূমিলালসার আত্মহননতুল্য পরিণাম,—যা এই গল্পগুলিতে দেখানো হয়েছে তার সবই টলস্টয়ের স্বীয় পরিণত মনন ও উপলব্ধি সঞ্জাত নীতিসার। গল্পগুলিতে নীতির আধিক্যে কখনও কখনও মনে হতে পারে এইগুলিতে নীতি প্রচার করা ছাড়া লেখকের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। মানবীয় অস্তিত্বের গভীর-গম্ভীর কিছু

অন্তর্গূঢ় সত্য, যা চিন্তাশীল মানুষের মৌলিক দার্শনিক ভাবনা-ধারণার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—সেগুলিকে ভাষা দেবার জন্যই লেখক নীতির আবরণে এই গল্পগুলির প্রচার করেছিলেন। নিছক নীতি অপেক্ষা এই রচনাগুলির তাৎপর্য আরও অনেক বেশী দূরপ্রসারী।

তাছাড়া গল্পগুলির শিল্পকর্ম অতুলনীয়। বাইবেলের প্যারাবলগুলির ধরনে অপূর্ব শিল্পসৌষ্ঠব মণ্ডিত সরল ভাষায় গল্পগুলির ঘটনা ও চরিত্রকে আকার দেওয়া হয়েছে। নীতির প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও বিশুদ্ধ শিল্পরূপকর্মের বিচারেই রচনাগুলির উৎকর্ষ প্রশ্নাতীত। অতিশয় অভিজ্ঞ ও পরিমার্জিত শিল্পী ছাড়া গল্পগুলির এমন নিখুঁত শিল্পরূপ দেওয়া কোনমতেই সম্ভব হতে পারতো না।

গল্পগুলির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গল্পের কাহিনীবৃত্তে যৌন প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। নরনারীর জৈব কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি দিয়ে কাহিনীর রূপ-রেখা নির্মাণ—যা কিনা আধুনিককালীন শতকরা পঁচানব্বুইটি গল্প-উপন্যাসের মূল অবলম্বন—তার এতটুকু প্রভাব এই রচনাগুলিতে চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর দ্বারা টলস্টয় সম্ভবতঃ এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, অস্তিত্বের মৌলিক অর্থের অনুসন্ধান যেখানে মানুষের জিজ্ঞাসু চিত্তকে অধিকার করে বসে, সেখানে কাম বা দেহবাসনা নিম্নতর প্রবৃত্তি হিসাবে মুখ লুকোবার পথ খুঁজে পায় না। জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর অর্থের অন্বেষণের পাশে এক সারিতে কামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে খোদ কাম বস্তুটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে, তাই টলস্টয় এই রচনাগুলিতে কামের প্রসঙ্গ সচেতনে ও সযত্নে বর্জন করেছিলেন।

তাছাড়া, গল্পগুলির এলাকা থেকে মদনদেব ও রতিকে নির্বাসন দেবার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই সব সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নরনারীর জৈব আকর্ষণের লীলা নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত বিলাসচর্চা কিংবা অশ্রান্ত বিশ্রম্ভালাপ করবার অবসর আদৌ থাকে না ভূয়োদর্শী প্রাজ্ঞ বর্ষীয়াণ লেখক বোধহয় এই ভাবটিকেই গল্প-গুলির মধ্যে মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছিলেন পরোক্ষভাবে। না হলে এ কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে-টলস্টয় তাঁর গল্পে উপন্যাসে নাটকে সমালোচনায় নরনারীর জৈব সম্পর্কের উল্লেখে পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন, বস্তুতঃ কাম ও প্রেম যাঁর রচনার বারো-আনা ভাগ জুড়ে আছে, তিনি হঠাৎ এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে এসে কাম ও প্রেম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মূক হয়ে যাবেন? এই নীরবতার নিশ্চয়ই কোন এক প্রণিধেয় তাৎপর্য রয়েছে। গর্কি টলস্টয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে

লিখেছেন, কথোপকথন কালে টলস্টয়ের আলোচনায় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে তিনটি প্রসঙ্গ বারে বারে ঘুরে ফিরে আসত স্থায়ী ধুয়ার মত। সে তিনটি প্রসঙ্গ হলো—ঈশ্বর, রুশ কৃষক এবং নারী। তাঁর লেখার মত তাঁর সংলাপেও নারী সর্বদাই প্রাধান্য বিস্তার করত। অবশ্য নারীর প্রতি সম্ভ্রমবোধের প্রকাশ তেমন ঘটতো না, তাচ্ছিল্যার্থেই তিনি প্রায়শঃ নারীজাতির উল্লেখ করতেন। সেই টলস্টয় তাঁর শেষ বয়সের গল্পগুলিতে নারী সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ এবং নর-নারীর জৈব আকর্ষণের চিত্রণে পুরাপুরি নিস্পৃহ এর অবশ্যই কিছু গভীর অর্থ রয়েছে। শ্রমজীবীরা বুর্জোয়া সমাজের অবসরবিলাসী পরশ্রমজীবী ভোগী সমাজের নরনারীর মত অসার প্রেমচর্চার কুটকচালি করে সময় নষ্ট করেন না—এইটেই দূরদর্শী অভিজ্ঞ লেখকের মনোভাবের নিহিতার্থ বলে বোধ হয়।

'দূরদর্শী' এই জন্য বলছি যে, পরবর্তীকালে লেনিন ঠিক হুবহু একই ভাবের কথা বলেছিলেন শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গে। কাম নিয়ে ভোগের ঢেকুর উদ্গার শুধু পুঁজিবাদী সমাজের বুর্জোয়া ভাবাশ্রিত সাহিত্যেই দেখা যায়, সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের সাহিত্যে এর বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যাবে না—এইটেই লেনিনের প্রতিপাদ্য ছিল। অবক্ষয়ধর্মী কামায়নের চিত্রণ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সাহিত্যের শেষ আশ্রয়—সাম্যবাদী সমাজের সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে মোড় নেবে, তার চিত্র ও চরিত্রের রূপায়ণে অশ্লীলতার লেশও থাকবে না। টলস্টয় লেনিনের এই স্বপ্নকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, এবং তারই অগ্রাভাস রূপে এই গল্পগুলিতে কামচিত্রণ সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আগেভাগে সূচিত করার এটি একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

নাটকের বেলায়ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রভাব চোখে পড়ে। যদিও টলস্টয় খুব বেশী নাটক লেখেননি তবে যে কটি লিখেছেন তার সবগুলিতেই ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা প্রসূত অনুভব-অনুভূতির ছাপ স্পষ্ট। দি পাওয়ার অব ডার্কনেস নাটকে নায়কের চরিত্রে যে পাপবোধ অঙ্কিত হয়েছে তা টলস্টয়ের স্বকীয় পাপবোধের প্রক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়। টলস্টয় পানদোষ নিবারণী অভিযানের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করে তাঁর দুটি নাটক আছে। তার মধ্যে ফ্রুটস অব এনলাইটেনমেন্ট নাটকটি সমধিক প্রসিদ্ধ। দি লিভিং কর্প্স নাটকে ফেদিয়ার বেঁচে থেকেও নিজেকে মৃত বলে প্রচার করে সংসার থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টার মধ্যে পাই টলস্টয়ের নিজেরই সংসার সম্বন্ধে বীতরাগ এবং পারিবারিক বন্ধন অতিক্রম করে মুক্ত স্বাধীন জীবনে উত্তরিত হওয়ার আকুতি।

টলস্টয় সাহিত্যের এই প্রকট বস্তুভিত্তিকতার জন্যই টলস্টয়ের রুশ সাহিত্য জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশের লগ্নে সমালোচকেরা এই বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যে, এই নূতন লেখক রুশ সাহিত্যে একটি নয়া আয়তন যোগ করেছেন—সত্যের আয়তন। টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতেও এই মর্মে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, তিনি যদি তাঁর গল্পোপন্যাসে প্রকৃত কোন নায়ককে অধিষ্ঠিত করে থাকেন তো তার নাম হলো—সত্য। সত্যই তাঁর ধ্যেয়, সত্যই তাঁর উপাস্য।

টলস্টয়ের জ্ঞানবাদী রচনাগুলিকে যদিও ঠিক সংজ্ঞার্থে শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, তহলেও এই মহান লেখকের সামগ্রিক সৃজনী ব্যক্তিত্বের অঙ্গ ও অংশ হিসাবে সেগুলির মূল্যায়ন করাটাও শিল্পবিচারের দিক থেকে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হয় না। কেননা তাঁর শিল্পভাবনা ও চিন্তাভাবনা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কথা ভাবা যায় না। তাঁর শিল্প ও ভাব-ভাবুকতা একই ব্যক্তিত্বের এপিঠ আর ওপিঠ।

টলস্টয় যদিও একাধিক ক্ষেত্রে চিন্তায় বিপ্লবী ছিলেন তবে তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের পশ্চাতে ফিরে যাবার টানও ছিল যাকে রক্ষণশীলতা বললে অত্যুক্তি হয় না। যেমন তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের দান রেলওয়ে টেলিফোন টেলিগ্রাফ ইত্যাদি, এগুলিকে তিনি সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। দ্বিতীয় জার আলেকজাণ্ডারের সার্ফ মুক্তি ও ভূমি সংস্কারের প্রয়াস তিনি সমর্থন করেছিলেন বটে, কিন্তু তদানীন্তন সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যে-দৃষ্টিতে করেছিলেন, সে-দৃষ্টিতে আদৌ নয়। তিনি বরং প্রগতিশীলদের মতামত ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনাই করে এসেছেন বরাবর। আসলে সার্ফদের চিরাগত শোষণ ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় যেমন তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন তেমনি তাদের জীবনের উপর থেকে যাকে বলে "বদান্য জমিদার" (তিনি নিজেকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে মনে করতেন এবং সত্যসত্যিও ছিলেন তা-ই) তাঁর প্রভাব অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনায় একই কালে বিমর্ষও বোধ করেছিলেন। রুশ কৃষকদের জীবন থেকে পিতৃপ্রতিম অভিভাবকের তুল্য শুভার্থী জমিদারের সং প্রভাব যদি চলে যায় তবে তারা কি সুদখোর, বণিক, আর সামরিক পুলিশের লোভের খপ্পরে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে না?—এই তাঁর আশঙ্কা। সনাতন রুশ কৃষকের প্রতি তাঁর দরদী চিত্তে ছিল অসাধারণ

মমতা। তিনি তাদের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাদের আদিম সারল্যে ও সততায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন।

আসলে টলস্টয় ছিলেন আজন্ম রুশোর ভক্ত। রুশোর মত তিনিও আধুনিক নগর সভ্যতার ছলাকলা, বিভ্রম, কপটতা, কৃত্রিমতা, বিলাস-ব্যসনের ঘোরতর বৈরী ছিলেন। রুশোর দর্শনের প্রতি তাঁর এই দুর্মর আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় কশাকস্ উপন্যাসে ওলেনিন-মারিয়াঙ্কার প্রেমকাহিনীর রাখালিয়া (প্যাস্টোরাল) ধরন-ধারণের মধ্যে এবং আনা কারেনিনা উপন্যাসের লেভিন-কিটি দাম্পত্য প্রেমের আখ্যানভাগের মধ্যে। তাঁর চিন্তামূলক সাহিত্যে সর্বত্র আদিম জীবনের সারল্যে প্রত্যাবর্তনের বাণী ঘোষিত—অবশ্য মৃণালভুক্ অলস গোষ্ঠগাথার (ইডিল্লিক) সারল্য নয়, পরিশ্রমপুষ্ট জীবনের সারল্য, বাইবেলোক্ত কপালের ঘাম ঝরানো খাটুনির দ্বারা রুটি সংগ্রহের সারল্য।

টলস্টয় খাঁটী নৈরাজ্যবাদী, তিনি ব্যক্তির স্বাধীন মুক্ত বিকাশের পক্ষপাতী, ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে তিনি বিশ্বাস করেন না। আধুনিক সভ্যতার করণ-কারণ ধরন-ধারণকে তাঁর বড়ই ভয় কেন না এই সভ্যতা কৃত্রিম পন্থায় অভাব-অভিযোগ বাড়িয়ে জীবনে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং তার ফলে মানুষের শান্তি-স্বস্তি নষ্ট হয়। শ্রমনির্ভর স্বল্পে তুষ্ট জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। দি গসপেল ইন ব্রীফ, হোয়াট আই বলিভ, হোয়াট দেন মাস্ট উই ডু?, অন লাইফ, দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ, দি টীচিং অব ক্রাইস্ট, এ লেটার টু অ্যান্ ইণ্ডিয়ান প্রত্যেকটি বইতে কোন না কোনও ভাবে এই আদর্শ বা এর রকমফের প্রচারিত। গান্ধীজির হিন্দ্ স্বরাজ বইটিকে যে টলস্টয় উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তার মূলে ছিল ওই বইয়ের আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণমূলক বক্তব্যের সঙ্গে টলস্টয়ের স্বকীয় মতের সাযুজ্য। আধুনিক কালীন বিজ্ঞানের বিরোধিতায় দুই চিন্তানায়ক চিন্তার সমভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাছাড়া দুয়ের মধ্যে অহিংসায় বিশ্বাসের মিল তো ছিলই।

টলস্টয় তাঁর একাধিক উপন্যাসে নাটকে ও প্রবন্ধে নরনারীর দাম্পত্য প্রেমের বন্ধনকে অধীনতার শৃঙ্খল রূপে বর্ণনা করে তার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ পরিচালনা করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মনু প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধানদাতাদের মতই নারীকে তিনি বহু অনিষ্টের কারক বলে মনে করতেন। এখানে তাঁর চিন্তার রক্ষণশীলতা ও অনুচিত চিত্তসংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। ডেভিল, ক্রুশ্জার সোনাটা প্রভৃতি উপন্যাসে, দি লিভিং করপস নাটকে এবং ডায়েরীর

বিভিন্ন দিনের রোজনামচায় তিনি নিতান্ত অসঙ্গতভাবে বিবাহিত নারীকেই সমস্ত দুর্গতির মূল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং কুমারীত্বকে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই অভিমত অস্বাভাবিক। কেননা মতটি স্বভাবগত নারী-মনস্তত্ত্বের বিরোধী তো বটেই জীববিজ্ঞানেরও বিরোধী। এই মত সমাজে কার্যকর হলে মানবজীবনের অস্তিত্বের ধারা অক্ষুন্ন থাকার প্রণালীই বিপন্ন হবে এবং পরিণামে জীবনপ্রবাহের স্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। নারীর প্রতি অহেতুক বিরাগবশতঃ ব্রহ্মচারিণিত্বের কাল্পনিক আদর্শকে সম্মান জানাতে গিয়ে টলস্টয় সুস্থ জীবননীতির বিপরীত মুখে চলে নারীপ্রগতির সর্বজন গৃহীত আধুনিক চিন্তাচেতনাকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। টলস্টয় এক সময়ে সোপেনহাউয়ারের দর্শন দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ নারীবিদ্বেষী জার্মান দার্শনিক তাঁর চিন্তার উপর অবাঞ্ছিত ছাপ ফেলেছে এ কথা না মেনে পারা যায় না। তাছাড়া খৃষ্টীয় মঠবাসিনীদের কুমারীত্বের আদর্শের প্রভাবও অলক্ষ্য নয়।

অথচ টলস্টয়ের প্রচারিত মতের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ধাঁচ-ধরনের বিশেষ কোন মিল ছিল না। তাঁর জীবনাচরণ ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি অবশ্য চেয়েছেন সংযম বন্ধনে নিজের জীবনকে কঠোরভাবে বাঁধতে এবং এ বিষয়ে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু সংযম বা ব্রহ্মচর্য বারে বারেই তাঁর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। স্বয়ং ব্রহ্মচর্যের প্রচারক হলেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবনে কম করেও তের-চোদ্দটি সন্তান উপহার দিয়েছিলেন! সোফিয়া তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন বার্ধক্যেও তাঁর স্বামীর কামনার আগুন পুরাপুরি নিভে যায়নি, কখনও-সখনও দপ্ করে জ্বলে উঠত। আসলে যে-জৈব দুর্বলতা মানবীয় রক্তমাংসের দেহধারী নর বা নারী যে-ই হোক নিজের মধ্যে প্রতিনিয়ত বহন করে চলেছে তার কবল থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য টলস্টয়ের অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না এবং সে-অধ্যবসায় প্রকৃতির ছলেই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক কখনও কখনও ব্যর্থ হলে তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ত নারী জাতির উপর। হতাশার মনস্তাপ জনিত প্রতিক্রিয়ার মুখে তিনি তখন নারীকে 'নরকের দ্বার', 'মানুষের সকল দুর্গতির মূল' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে গায়ের জ্বালা মেটাতে চাইতেন।

তাছাড়া, দাম্পত্য বন্ধনের উপরে তাঁর এত যে রাগ, একমাত্র অসুখকর শেষের পর্বটি বাদ দিলে তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবন কিন্তু মোটামুটি শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। বিবাহিত জীবন স্বীকার করে গার্হস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পর থেকে টলস্টয়ের উদ্দামতা বহুল পরিমাণে শমিত হয়ে গিয়েছিল, বহির্মুখী মন ঘরমুখো হয়েছিল। স্ত্রীর সংসার-পরিচালন-দক্ষতায় জমিদারীর আয় অনেক বেড়েছিল, টলস্টয় সাহিত্যরচনায় একান্তরূপে ব্যাপৃত হয়ে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রন্থ-বিক্রয় থেকে প্রচুর আয় হতে থাকে। ('জীবন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে তো নবদম্পতির জীবন একেবারে স্বর্গীয় সুখের আগার ছিল বলা যায়। টলস্টয়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যাভেল বিরুকভ লিখেছেন, নববিবাহিত টলস্টয়দের দাম্পত্য জীবন তো নয় যেন "ইয়াসনায়া পলিয়ানা গোষ্ঠগাথা"।

সেই টলস্টয় কেন কালক্রমে দাম্পত্য জীবনের উপর এতদূর খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর একাধিক গ্রন্থে বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সেটি বুঝতে হলে টলস্টয়ের চিন্তাদর্শনের বিবর্তনের স্তর-পরম্পরা অনুসরণ ও অনুধাবন করে দেখতে হয়। স্থূল রক্তমাংসের চাওয়া-পাওয়ার কামনা থেকে মুক্তির প্রয়াসে টলস্টয়ের চিন্তা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছিল এবং এক সময়ে কোনওরূপ পারিবারিক কিংবা সাংসারিক বন্ধনকেই তিনি আর স্বীকার করতে চাননি। তাঁর শেষ বয়সের লেখাগুলিতে এই মুক্তির ইচ্ছারই অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই।

দি কশাকস বইটিকে প্রকৃত অর্থে টলস্টয়ের প্রথম উপন্যাস গণ্য করা যায়। আগের বই কয়টিতে ছিল গল্প-কাহিনীর সঙ্গে আত্মজীবনীর উপাদান মিশানো, আত্মজীবনীরই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু এতে উপন্যাসের শিল্পটাই বড় হয়ে উঠেছে। এতেও আত্মজীবনী রয়েছে, তবে সেটা পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষে একটা নিটোল কাল্পনিক আখ্যান বইয়ের মূল কথাবস্তু হিসাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। টলস্টয়ের ভাবশিষ্য প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও মনীষী রোমাঁ রোলাঁ টলস্টয়ের এই বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"টলস্টয়ের বর্ণনাশক্তির সবটুকু জোর এই চমৎকার উপন্যাসটিতে প্রকটিত এবং তাঁর বাস্তবতা মানবচরিত্রাঙ্কনে সমান জোরের সঙ্গে প্রকাশিত।" কশাকস বইয়ের ভূমিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমালোচক কে. ডি. রিভ লিখেছেন—"টলস্টয় সম্পর্কে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হলো তিনি এক মহৎ ঔপন্যাসিক, কারণ তিনি এত চমৎকার করে লিখতে পারতেন যে বলবার নয়।"

এই চমৎকার করে লিখতে পারাটাই হচ্ছে আসল কথা। কি বর্ণনক্ষমতায়

কি চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতায়। টলস্টয় যখন কশাক বইটি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স আটাশ আর মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে বইটি যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই তাঁর চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা কত-দূর পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল অনুবাদে তার একটু নমুনা দিই।

কশাক উপন্যাসের নায়ক ওলেনিনের চরিত্র তিনি এঁকেছেন এভাবে—

"আঠার বছর বয়সে ওলেনিন নিজেকে স্বাধীন বিবেচনা করলেন। ১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে বর্ধিত বাপ-মা-হারানো রুশ তরুণের পক্ষেই কেবলমাত্র এমনতর স্বাধীন হওয়া সম্ভব। তার কোন বাস্তব অথবা নৈতিক বাধ্যবাধকতা রইলো না। সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে, কারও কাছেই তার দায় নেই, কিছুরই দ্বারা সে আবদ্ধ নয়। তার পরিবার নেই, দেশ নেই, ধর্ম নেই, অভাব নেই। সে কিছুই বিশ্বাস করে না, কিছুই মানে না। মোটেই বিষণ্ন নয় সে, না বা অবসাদগ্রস্ত, না বা মতসর্বস্ব। উল্টো, সে সব সময়েই কোন না কোন কিছুর দ্বারা উত্তেজিত, চালিত। যদিও সে মনে মনে স্থির করেছে যে প্রেম বলে কিছু নেই, তাহলেও যখনই সে কোন সুন্দরী তরুণীর মুখোমুখি হয়, সে অভিভূত বোধ করে। বেশ কিছুকাল থেকেই সে ভেবে রেখেছে যে সম্মান প্রতিপত্তি এসবের কোন অর্থ হয় না, তৎসত্ত্বেও সে বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব না করে পারেনি যে, এক বল নাচের আসরে প্রিন্স সার্জি যখন উপযাচক হয়ে এসে তাকে কিছু মিষ্ট বাক্য বললেন, সে পুলকিত বোধ করেছে। অবশ্যি তার উন্মাদনা ততক্ষণই টিকে থাকে যতক্ষণ তাকে কিছু দায় বহন না করতে হয়। যখনই সে বোঝে যে তার অনু-ভূতির উপর চাপ পড়ছে বা তাকে ধকল সইতে হচ্ছে, সে তক্ষুনি ওই দায়িত্ব-বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে স্বাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

"এইভাবেই সে তার সমাজ, কাজকর্ম, জমিদারী পরিচালন, সঙ্গীত যা কিনা সে একসময় শিখবে বলে মনস্থ করেছিল—এইসবকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এমন কি প্রেম, যাতে তার বিশ্বাস ছিল না, তাকেও এই দৃষ্টিতেই দেখতে শিখে ছিল। সে স্থির করতে পারছিল না জীবনে একবারই মাত্র যে যৌবনশক্তি মানুষকে অর্পণ করা হয় সেই ক্ষমতাকে সে কী কাজে লাগাবে—বিদ্যাচর্চায়, না শিল্পানু-শীলনে, না নারীর প্রেমান্বেষণে, না আর কোন সাংসারিক বাস্তব কাজে। এটি তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা নয়, হৃদয়ের ক্ষমতাও নয়, অথবা শিক্ষাসূত্রে অর্জিত গুণা-বলী নয়, এটি সেই বিরল উৎসাহ বা মানুষকে প্রকৃতির দেওয়া সেই অদম্য শক্তি যার দ্বারা সে নিজেকে ইচ্ছামত গড়েপিটে তুলতে পারে, এমনকি তার মনে হয় পৃথিবীকেও যদৃচ্ছ এইভাবে গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। অবশ্য এমন অনেক লোক

আছে যারা এই জীবনীশক্তি বঞ্চিত, সেই সব মানুষ যারা কর্মক্ষেত্রে নেমেই কাজের জোয়ালে নিজেদের জুড়ে নিয়ে সারা জীবন কাজের ঘানি টানে। কিন্তু ওলেনিন সেরকম নয়, সে তার স্বভাবে যৌবনের এই প্রচণ্ড দুর্দম শক্তির টান ভীষণভাবে অনুভব করে—সেই শক্তি, যা তার গোটা জীবনকে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষায় ও একটি মাত্র চিন্তায় রূপান্তরিত করতে পারে—চাওয়ার শক্তি, পাওয়ার শক্তি, কারণ না জেনেই অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার শক্তি। সে তার এই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, এর জন্য সে গর্বিত, এবং তার সুখের মূলে এই ·চতনাটাই যে কাজ করছে সেটা না জেনেই সে সুখী।

"এযাবৎ সে নিজেকেই শুধু ভালবেসে এসেছে। সে নিজেকে ভাল না বেসে পারেনি। কারণ জীবন থেকে সে শুধু ভাল জিনিসের প্রত্যাশা করেছে, নিরাশ হওয়ার তার অবসর ঘটেনি। মস্কো ছাড়ার পর থেকে তার মনে কেবলই সেই স্ফূর্তির ভাবটি জাগছে যার প্ররোচনায় একজন যুবার সহসা মনে হতে থাকে যে, এ পর্যন্ত তার জীবে· যা কিছু ঘটেছে তার সবই অবাস্তব, আকস্মিক, অকিঞ্চিৎকর, বস্তুতঃ, ওই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সে বাঁচতেই চেষ্টা করেনি। এখন যখন সে মস্কো ছেড়েছে, সে নতুন করে জীবনারম্ভ করতে যাচ্ছে, এখন থেকে সে কোন ভুল করবে না, কোন অনুশোচনা আর নয়, নিশ্চিত সুখ তার হাতের মুঠোয় ধরা দিল বলে।"

চরিত্রাঙ্কন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণশক্তির নৈপুণ্যও লক্ষণীয়। বর্ণনশক্তির নিদর্শনরূপে কশাকস বই থেকেই আর একটি অংশ তুলে ধরছি—

"গ্রেবেন কশাকদের উপনিবেশ তেরেক নদীর ধার ধরে পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত। গ্রামাঞ্চলটি সমতল। তেরেক নদী, যা কিনা কশাকদের পাহাড়ী বাসিন্দাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, এখানে বেশ দ্রুতগতি ও উদ্দাম, যদিও এই অংশে নদীটি কিছুটা বিস্তৃত ও মসৃণগতি হয়ে উঠেছে। নদীর সরবন আচ্ছাদিত নীচু ডান পাড়ে তেরেক নদী ধূসরবর্ণের বালির আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে; এদিকে তার খাড়া নাতিউচ্চ বাম পাড়ে একশো বছরেরও বেশী পুরনো ওক গাছ জীর্ণ সব সাদাসিধা আকৃতির সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গাছ এবং তরুণ লতাগুল্মের ঝাড় পাড়টিকে ক্রমেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফোঁপরা করে তুলেছে। ডান পাড়ে অবদমিত কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও অশান্ত তাতারদের গ্রাম। বাম পাড়ে নদী থেকে আধ মাইল টাক দূরে, পাঁচ থেকে ছ' মাইল অন্তর অন্তর কশাকদের আগাম ঘাঁটিসকল চোখে পড়ে। আগে এই বাম পাড়েই কশাকদের বসতি ছিল কিন্তু তেরেকের গতি প্রতি বছরই পাহাড়কে একপাশে রেখে ক্রমাগত উত্তর দিকে বাঁক নেওয়ায় পাড়টিকে এতটাই

ঝাঁঝরা করে এনেছে যে, এখন আর সেখানে কোন বসতির চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল পড়ে আছে পরিত্যক্ত ভিটা, বাগ-বাগান, আঙ্গুরক্ষেত, প্রভৃতি। আঙ্গুর-ক্ষেতগুলি ব্ল্যাকবেরি আর বন্য আঙ্গুরলতার ঝোপে আচ্ছন্ন। এখন আর কেউ সেখানে বাস করে না। বালির উপরে আর একটি মাত্র যে-পথচিহ্নের রেখা চোখে পড়ে তা হলো হরিণ, নেকড়ে, খরগোশ এবং পক্ষিবিশেষদের আনাগোনার পথ। এই সব প্রাণী এই এলাকাটাকে বিশেষ পছন্দের চোখে দেখেছে বলে বোধ হয়।

"কশাকদের বাড়ীঘর বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সোজাসুজি বিস্তৃত পথঘাটের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই সব রাস্তায় কশাকদের টহল-চৌকি আর প্রহরার ঘাঁটিগুলি যেন একটা সংরক্ষিত এলাকার সৃষ্টি করেছে। কশাকদের গ্রামটি অনুমান সাতশো গজ চওড়া এক উর্বর বনভূমির সংকীর্ণ মৃত্তিকাখণ্ডের উপরে অবস্থিত। উত্তরে নোগে ও মোজডোক তৃণাঞ্চলের বালুকাস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বিস্তার, সেগুলি আবার আরও উত্তরে প্রসারিত হয়ে টার্মেন, আস্ত্রাখান ও কিরঘিজ তৃণভূমিতে গিয়ে মিশেছে। দক্ষিণে প্রসারিত চেচেন, কোচলভ প্রভৃতি পাহাড় এবং কৃষ্ণ পর্বত ও অন্য একটি পর্বতের সারি, যার ওই পাড়ে দেখা যায় সেই সব তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ যা কেউ কখনও ডিঙোয়নি। এবং এই উর্বরা বনভূমির শস্যশ্যামল সংকীর্ণ ফিলতে অংশটিতেই এই সব যুদ্ধপ্রিয় সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিত সমৃদ্ধ পুরাতন ধারার ধর্মবিশ্বাসী গ্রেবেন কশাকের দল স্মরণাতীতকাল থেকে বাস করে আসছে।"

বর্ণনায় খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের দিকে যেমন ঝোঁক লক্ষণীয়, তেমনি ছবি ফুটিয়ে তোলার কুশলতাও সমান উল্লেখ্য। আলেখ্য অঙ্কনের এই বৈশিষ্ট্য ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, আনা কারেনিনা, রেসারেকসান প্রভৃতি উপন্যাসেও সমভাবে চোখে পড়ে। ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্ উপন্যাসের যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনাগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য সামান্যই ধরা পড়ে, তাই পরের বইগুলি থেকে আর অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হলুম না। যে দুটি নমুনা উৎকলন করা হয়েছে তাতেই প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণের নমুনা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি।

টলস্টয় ও ভারতবর্ষ

টলস্টয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ বিগত শতকের শেষভাগে আরম্ভ হয়। শুধু যে তাঁর রচনাবলীর সঙ্গেই ভারতবাসীর পরিচয় সাধিত হয়েছিল তা-ই নয়, কারও কারও তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল পত্রালাপের মাধ্যমে। তবে যে-টলস্টয়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় হয়েছিল তিনি শিল্পী নন; দার্শনিক টলস্টয়, ঋষি টলস্টয়। টলস্টয়ের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চ ভাবুকসত্তা বিগত শতকের ভারতবাসীদের সমধিক মনোহরণ করেছিল। রাশিয়ার জাতীয় জীবনে টলস্টয়ের ঋষিপ্রতিম ভূমিকা তাঁকে ভারতবাসীর চোখে এক বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সেইভাবেই তাঁরা দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

এ কথা সুবিদিত যে টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের ছিল নানান দিক। তীব্রদ্যুতিময় বহু কোণবিশিষ্ট হীরকখণ্ডের মত টলস্টয়ের প্রতিভা নানা মুখে ছড়ানো ছিল এবং তার প্রত্যেকটি দিক থেকেই উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়তো। শিল্পরসিকের কাছে তিনি ছিলেন শিল্পী, সাহিত্যপাঠকের কাছে মস্ত বড় ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার, দার্শনিকভাবাপন্ন মানুষের কাছে দার্শনিক, ধর্মভাবুকের কাছে ধার্মিক, অহিংসার অনুরাগীদের কাছে অহিংসা তত্ত্বের সাধক, ভক্ত ক্রিশ্চিয়ানের কাছে খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান, কৃষিপ্রেমীর কাছে আন্তরিক কৃষকদরদী মহাত্মা, রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরোধীদের কাছে আপসহীন নৈরাজ্যবাদী, দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বৈরী, ইত্যাদি। অর্থাৎ লোকে তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি প্রবণতা ও বিশ্বাস অনুযায়ী যিনি যেভাবে তাঁকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন, তিনি সেইভাবে তাঁদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

অথচ মানুষটি ছিলেন অবিভাজ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক অখণ্ড সত্তা। তাঁর বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি ছিলেন এক পরিপূর্ণ ব্যক্তি—পরিপূর্ণতার সাধনায় তিনি বহুমুখে তাঁর চিন্তাভাবনাকল্পনাকে পরিচালিত করেছিলেন। ধর্ম দর্শন সাহিত্য সমাজতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব কৃষিসমস্যা শিক্ষাসমস্যা জীবননীতি রাষ্ট্রনীতি কিছুই তাঁর জিজ্ঞাসার বহির্ভূত বিষয় ছিল না। প্রচলিত অর্থে তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, তবে রাজনীতির ভাবনাচিন্তায় তাঁর মনের সচলতার কিংবা চেতনার প্রখরতার কোন অভাব ছিল না। সমাজে ও রাষ্ট্রে যারাই ছিল নিপীড়িত শোষিত অত্যাচারিত তাদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় সহানুভূতি। রুশ চাষীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কিংবা নির্যাতিত ধর্মসম্প্রদায় দুখোবরদের পক্ষ নিয়ে

লড়াই করতে গিয়ে তিনি এমনকি রুশ সম্রাটের বিরাগভাজন হতেও পশ্চাৎপদ হননি। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সংস্কারবিমুক্ত চিন্তার জন্য রুশ অর্থোডক্স চার্চ তাঁকে তাঁদের মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করে ছেড়েছিলেন। কায়িক শ্রমের আদর্শের প্রতি আনুগত্য বশতঃ জন্ম-অভিজাত টলস্টয় শেষ জীবনে রুশ কৃষকের মত সরল জীবনযাপন করতেন এবং চাষের কাজ সমেত সমস্ত রকমের শারীরিক শ্রমের কাজ নিজ হাতে করবার চেষ্টা করতেন, মায় নিজের হাতে নিজের জুতো মেরামতির কাজ পর্যন্ত। সরল অনাড়ম্বর দিনযাত্রা ও আত্মনির্ভরশীলতার নীতিকে সত্যিসত্যি জীবনাচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে এমন আন্তরিক আকুলতা মহাপুরুষ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না তাঁর মত। প্রকৃতপক্ষে, শিল্প ও মানবতার তিনি এক বিরল সমন্বয় এ ভুবনে। এ জাতীয় সমন্বয় পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কোটিতে গোটিক বললেও চলে।

টলস্টয়ের এই শেষোক্ত অর্থাৎ মানবতাবাদী রূপটিই গত দিনের ভারতবাসীর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। টলস্টয়ের সাহিত্যের পঠন পাঠন চর্চা ও অনুশীলন আরও পরেকার ঘটনা।

পুরাতন অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য তদানীন্তন পত্রপত্রিকার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় টলস্টয় একদা আমাদের দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, যথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ (তখন অরবিন্দ ঘোষ) কে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। টলস্টয়ের চিন্তার কোন্ দিক্ তাঁদের ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল? —টলস্টয়ের কঠিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার দিক্ এবং পশ্চিম ইউরোপখণ্ডে প্রচলিত ভোগবাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় আপসহীন মনোভাবের দিক্। এছাড়া ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে টলস্টয়ের আগ্রহ ও অভিনিবেশ তাঁদের শ্রদ্ধা আরও বেশি আকর্ষণ করে থাকবে।

টলস্টয় প্রথম বয়স থেকেই ভারতীয় চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর টলস্টয়-জীবনী থেকে জানা যায় টলস্টয়ের বয়স যখন উনিশ তখন তিনি এক তিব্বতীয় লামার কাছ থেকে বৌদ্ধধর্মের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকাকালে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তিনি যে দু-একটি প্রাচ্য ভাষারও অনুশীলন করেছিলেন তার নজীর আছে। পরে যখন প্রৌঢ় বয়সে তাঁর জীবনে এক প্রচণ্ড আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সংকট দেখা দেয় তখন তিনি পুনরায় ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদি—বেদ উপনিষদ, ধম্মপদ, সুত্তনিকায়, রামায়ণ-মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন

করেন। টলস্টয়ের এই ভারতবিদ্যানুরাগ তাঁর সঙ্গে ভারতবাসীদের যোগাযোগের একটি অতিরিক্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণ হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মনে হয় টলস্টয়ের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব, তার মধ্যেও আবার বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণার অনুভূতি, পূর্বোক্ত ভারতীয় দেশপ্রেমিক মনীষীদের চিন্তাকে বিশেষভাবে উচ্চকিত করেছিল এটা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ছলাকলা-চাতুরী ও স্বীয় অভীষ্টসাধনে অন্তহীন কূটকৌশলপারঙ্গমতা এই জাতটার প্রতি টলস্টয়ের মনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন বিরাগের অনুভবই সৃষ্টি করতে পেরেছিল, আর কিছু নয়। টলস্টয় ভারতীয়দের পরাধীনতা সম্পর্কে লিখেছেন—"ইতিহাসে এমন আর একটি দৃষ্টান্তের নজির নেই যেখানে ভারতবর্ষীয়দের মত এমন অগণিত সংখ্যক মানুষ মুষ্টিমেয় সংখ্যক কিছু বিদেশীর পদানত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আসে, বাণিজ্যিক চাতুরীর দ্বারা লোককে বশ করে। তারপর সেই বশ্যতাকে পাকা করবার জন্য আনে সৈন্যদল।" টলস্টয় বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়রা নীতিগতভাবে ও আত্মিক দিক থেকে ইংরেজদের চেয়ে উন্নততর মানুষ। তাঁর কথা হলো "ইংরেজ ভারতীয়দের জয় করেছে ঠিক কিন্তু ভারতীয়রা ইংরেজের চেয়ে বেশি স্বাধীন। তারা ইংরেজদের ছাড়া বাঁচতে পারে কিন্তু ইংরেজরা তাদের ছাড়া বাঁচতে পারে না।"

টলস্টয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম তাঁর ভাল লেগেছিল তার কারণ বুদ্ধ জাতিভেদের বিরুদ্ধে সুতীব্র অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখবার ও আত্মশ্রেষ্ঠত্বাভিমান চরিতার্থ করবার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সৃষ্ট বর্ণভেদ প্রথা তিনি জাতিভেদেরই মত ক্ষতিকর বলে মনে করতেন এবং তাকে জাতিভেদেরই মত একটি মোক্ষম পীড়নের যন্ত্র জ্ঞান করতেন। টলস্টয় বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিবেকানন্দের রচনা তাঁর ভাল লাগতো এ কারণে যে, বিবেকানন্দ জাতিভেদের বৈরী ছিলেন, অধিকন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একজন ক্ষমাহীন সমালোচকও তাঁকে বলা যায়। নিপীড়িত জনদের প্রতি বিবেকানন্দের অমেয় দরদ এবং দরিদ্রের ভিতর ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন পরিমণ্ডলগত হলেও এই দুই ভাবুককে এক বিন্দুতে এনে মিলিয়েছিল। ধনৈশ্বর্যের প্রতি সন্ন্যাসীসুলভ বীতস্পৃহাও এই দুই ভাবুকের মধ্যে একাত্মতার কারণ।

'দি এরিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক এ. রামাশেষণ নামক এক ভদ্রলোক টলস্টয়কে মাঝে মাঝে পত্র লিখতেন এবং ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এই

মহামনস্বী রুশ লেখকের উপদেশ পরামর্শ প্রার্থনা করতেন। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের যে-দুর্দশা হয়েছে তার কবল থেকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় কী এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে টলস্টয় রামাশেষণকে পত্রোত্তরে লিখেছিলেন যে, ভারতবাসীরা ইংরেজের অধীনতার ফলে যে হীনদশায় পড়েছে তার থেকে উদ্ধারলাভের একমাত্র পথ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অসহযোগ। ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে ও অন্যান্য শাসনাধিকারে কাজ করতে ভারতীয়রা বলিষ্ঠভাবে অস্বীকার করুন, তাহলেই ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরেজের গোলামি করতে তৈরি থাকবে, ততদিন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী অভিশাপগুলিও টিকে থাকবে। ইংরেজের সিপাহি হতে রাজি হওয়া ইংরেজ রাজত্বকে জীইয়ে রাখারই সামিল বলে তিনি মনে করেন। হিংসার রাজত্ব হিংসার সাহায্যেই টিকে থাকে। তারপরই করেছেন জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁর অনমনীয় বিরোধিতার মনোভাব যুক্ত সুচিন্তিত উক্তি: "ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক কোন যুক্তিতেই ভারতবর্ষের মনুষ্য-সম্প্রদায়কে অনেকগুলি জাতপাতের থাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা সমর্থন করা যায় না। জাতিভেদ মানবজাতির মানবিক ভিত্তিমূলটিকেই আঘাত করে।"

উপরের মন্তব্যের আলোকে পরিষ্কার দেখা যায় টলস্টয় তাঁর এই প্রসিদ্ধ রচনায় ভারতবর্ষীয়দের তাঁদের যুগযুগ সঞ্চিত কুসংস্কার পরিহার করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন—এমন সব আবর্জনাতুল্য কুসংস্কার, যা সত্যকে আবৃত করে রেখেছে। ভারতীয়দের পরাধীনতার জন্য ভারতীয়রাই দায়ী, ইংরেজ নয়। ভারতীয়দের সহযোগিতা না পেলে ইংরেজ কখনোই এ দেশ শাসন করতে পারতো না। টলস্টয় যদিও অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ পছন্দ করতেন না, তাহলেও তাঁর কথা হলো—"অন্যায়ের প্রতিরোধ করো না, তা বলে নিজেরাও অন্যায় করো না। ইংরেজের শাসনযন্ত্রের যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে, যেমন প্রশাসনিক কাঠামো, আইন-আদালত, রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থা, সর্বোপরি সেনাবাহিনী, এগুলির সঙ্গে অসহযোগিতা যদি করতে পারো, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা তোমাদের পরাধীন করে রাখতে পারে।"

রামাশেষণ ছাড়া আর যে সব ভারতীয় সাংবাদিক টলস্টয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন এবং উত্তরও পেতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'রিভিয়্যু অব্ রিলিজিয়ানস্' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাদিক, 'দি লাইট অব্ এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদক প্রেমানন্দ ভারতী, 'দি নিউ রিফর্মার' পত্রিকার উদারচেতা সম্পাদক গোপাল চেট্টি, কানাড়া থেকে প্রকাশিত 'ফ্রী হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর তারক-

নাথ দাস প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত পত্রলেখক ড. দাসের পত্রাবলী নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর চরম মতামতসংবলিত পত্রগুচ্ছ টলস্টয়কে "জনৈক ভারতবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পত্রটি ভারতে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। যদিও এই পত্রে টলস্টয় সহিংস সংগ্রামের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন —তিনি অহিংসার পক্ষেই তাঁর বক্তব্য রাখেন তাহলেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার বইটি বাজেয়াপ্তকরণের আশুকারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু দাস ছিলেন বিপ্লবী, সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতী ; পক্ষান্তরে টলস্টয় ছিলেন অহিংস মন্ত্রের সাধক। তাঁদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে উভয়ের মধ্যে মতসংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল—পত্রমালায় তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। দাস ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার ও বঞ্চনা সম্পর্কে একাধিক তথ্যসম্বলিত পুস্তক ও পুস্তিকা টলস্টয়কে পাঠিয়েছিলেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ওই সমস্ত পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত 'ভারতবাসীর কাছে খোলা চিঠি'খানা লেখেন।

চিঠিতে ভারতের ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং একটা লোভী পরস্বাপহারী বিদেশাগত সরকার কীভাবে একটা গোটা জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে তার মর্মন্তুদ বর্ণনা আছে। কিন্তু টলস্টয় এই অবস্থার প্রতিকারের যে উপায় নির্দেশ করেছেন তা বিপ্লবীদের চিত্ত জয় করতে পারেনি। টলস্টয়ের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতের শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো অহিংস অসহযোগ। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ তথা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারাই ইংরেজ শক্তিকে ভারতভূমি থেকে উৎখাত করতে হবে। দাস লিখলেন– "আপনি ভারতীয় পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অতি সঠিক, ইংরেজ শাসনের এর চেয়ে কঠিন সমালোচনা আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আপনার প্রদর্শিত প্রতিকারের পথ মেনে নিতে পারছি না। অহিংসার দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে হিংসাশ্রয়ী ইংরেজ সরকারের অবসান ঘটানো যাবে না। সেটা অবাস্তব পন্থা।"

টলস্টয়ের এই বিখ্যাত চিঠির সূত্রেই তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর যোগাযোগ। গান্ধীজি এই চিঠি পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ এই চিঠিতে টলস্টয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে যে অহিংস অসহযোগ

তথা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন তাতে তিনি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হন। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সে দেশের বুয়র সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নিরত। সালটা ১৯০৭-০৮। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবীদের (ইনডেনচারড্ লেবারার) এবং তদীয় বংশোদ্ভূত সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি জেনারল স্মাট্স্-এর সরকারের বিরুদ্ধে এক নতুন ধারায় সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছিলেন, সত্যাগ্রহ যার নাম। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বা 'প্যাসিভ রেজিস্টান্স' ছিল এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ভিত্তি। ১৯০৮ সালে এই সংগ্রামের শুরু, ১৯১৪ সালে এর সাফল্য-জনক পরিসমাপ্তি। বলা প্রয়োজন গান্ধীজি তাঁর এই নবপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় প্রতি-রোধের পদ্ধতি টলস্টয়ের শিক্ষা থেকে আহরণ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর আরেক গুরুর নাম আমেরিকান দার্শনিক ওয়াল্ডেন-হ্রদতীরবাসী থোরো, যিনি সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে অহিংস খাজনা-বন্ধের আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রজাপুঞ্জকে এক নতুন ধরনের সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। টলস্টয় এবং থোরো এই দুজন হলেন গান্ধীজির অহিংসা সংক্রান্ত ভাবজীবনের মূল সঞ্চালক।

গান্ধীজি টলস্টয়ের সঙ্গে নিয়মিত পত্র বিনিময় করে প্রেরণা সংগ্রহ করতেন। টলস্টয়ও তাঁর অফুরন্ত কর্মব্যস্ততা আর বার্ধক্যের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গান্ধীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর এক অনুগত মানস-শিষ্য এবং তাঁকে চিঠি লিখে আনন্দ পেতেন। টলস্টয়ের লেখা এই সমস্ত বই পড়ে গান্ধী সবিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন যথা, 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইয়ু'. দি গসপেল ইন ব্রীফ্', 'হোয়াট দেন মাস্ট উই ডু?', 'দি টীচিং অব ক্রাইস্ট' প্রভৃতি। টলস্টয়ের পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্মম সমালোচনা গান্ধীর চিন্তাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল অনুমান করবার কারণ আছে। কেন না ১৯০৯ সালে প্রকাশিত গান্ধীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' বই টলস্টয়েরই মত পশ্চিমী সভ্যতার কঠিন ধিক্কারে পরিপূর্ণ। এ বইয়ে গান্ধীজি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে "শয়তানের সভ্যতা" রূপে অভিহিত করেছিলেন। পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে টলস্টয়ও একই মত পোষণ করতেন।

দুইয়ের মধ্যে পত্রযোগে যে গভীর সৌহার্দ্যমূলক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আরও ফলপ্রসূ হতে পারতো যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর টলস্টয়ের মৃত্যু হতো। গান্ধীজি টলস্টয়ের প্রতি তাঁর ঋণ শুধু ঘোষণাতেই আবদ্ধ রাখেননি, কার্যকরভাবেও সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজি টলস্টয়ের শিক্ষাদর্শ ও জীবনাচরণের নীতিকে বাস্তবে

রূপদানের উদ্দেশ্যে দুটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি জোহানেসবার্গের 'টলস্টয় ফার্ম' ও অন্যটি ট্রান্সভালের 'ফিনিক্স সেটেলমেণ্ট'। সে দুটি প্রতিষ্ঠানে টলস্টয়ের সরল জীবনচর্চা ও কায়িকশ্রমের আদর্শকে কাজের ধারার ভিতর পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হতো। শিক্ষা ছিল জীবিকাভিত্তিক, শ্রম ছিল স্বাবলম্বনপন্থী ও উৎপাদনশীল। গান্ধীজির পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপের ভিতর টলস্টয়ের প্রচারিত 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' এর প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত।

২

বাংলা ভাষায় টলস্টয়-সাহিত্যচর্চার একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে। টলস্টয়ের রচনার আদি অনুবাদকদের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেন ও তাঁর কন্যা কবি কামিনী রায়ের নাম পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল আচার্য এবং দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন আর দু'জন আদি অনুবাদক। দুর্গামোহন শুধু টলস্টয়ের গল্প ও অন্যবিধ রচনার অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, টলস্টয়ের জীবনদর্শন ও ঋষিকল্প ব্যক্তিত্ব নিয়েও একদা অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রচার করেছিলেন। বৃত্তিতে শিক্ষক এই লেখক আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলার জনসমাজের ভিতর টলস্টয়ের বাণী প্রচারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের স্কুল-জীবনে আমরা তাঁর লেখা পড়েই প্রথমে টলস্টয়ের বিষয়ে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাই। এর আগে আর যাঁরা টলস্টয় সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরবর্তীকালে আর যে সব লেখক অনুবাদে অথবা আলোচনায় বাংলা সাহিত্যে টলস্টয়ের প্রচার করেছেন তাঁদের কয়েকজন অগ্রণীর নাম—দিলীপকুমার রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বর্মন, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি বাগচী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অক্লান্তকর্মা অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আরও একাধিক রুশ গ্রন্থ অনুবাদের পাশে পাশে টলস্টয়ের 'ক্রুশ্‌জার সোনাটা' বইখানা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় 'টুয়েন্টি-থ্রি টেলস'-এর একটি গল্পের অনুবাদ দ্বারা তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন। এ ভিন্ন টলস্টয় সম্বন্ধে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধও আছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' বই-

খানা সুপরিচিত। বৃহদায়তন উপন্যাস 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কৃত বাংলা ভাবানুবাদ 'যুদ্ধ ও শান্তি' বাংলা ভাষায় অন্যতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনুবাদকর্মের গৌরব দাবি করতে পারে। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 'হোয়াট ইজ আর্ট ?' বইখানি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বিমলাপ্রসাদ 'দি ডেভিল' উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ করেছেন 'শয়তান' নামে। সম্প্রতি নাট্য-প্রযোজক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যদল 'নান্দীমুখ' টলস্টয়ের 'দি পাওয়ার অব ডার্কনেস' নাটকটির বাংলা নাট্যরূপ 'পাপপুণ্য' উপস্থিত করেছেন বাংলার দর্শক সমাজের সামনে। নাটকটির অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।

আমাদের দিকপাল লেখকদের উপর টলস্টয়ের প্রভাব কতটা কী পরিমাণ পড়েছে তার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা কঠিন। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ একবার যৌবনে 'আনা কারেনিনা' উপন্যাস-খানা পড়বার চেষ্টা করেছিলেন, খুব বেশী দূর এগোতে পারেন নি। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা 'ছিন্নপত্রগুচ্ছে'র একখানি চিঠিতে তিনি এই বলে তাঁর মনের বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে, উপন্যাস পড়তে গিয়ে এত খুঁটিনাটি বর্ণনা পড়তে বিরক্তি ধরে, তাই তিনি উপন্যাসটি শেষ করার চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্রনাথ খুব সম্ভবতঃ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র লেভিনের জীবনযাত্রায় রুশ কৃষিকর্ম পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাই ওই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু 'আনা কারেনিনা' গ্রন্থ তো শুধুই একটি প্রেমের উপন্যাস নয়, একই সঙ্গে সেটি রুশ কৃষিজীবনেরও দর্পণ। নাগরিক জীবনাচারে লালিত আনা ও ভ্রন্‌স্কির অবৈধ প্রণয়ের পৃষ্ঠে পল্লীর কোলে বর্ধিত রুশকৃষক লেভিন ও কিটির অমলিন প্রেমকে প্রতিস্পর্ধী ঘটনারূপে চিত্রিত করে টলস্টয় প্রকারান্তরে এই উপন্যাসে সরল জীবনযাত্রার আদর্শকেই মহিমান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। লেভিন-কিটি কথা ওই উপন্যাসের সামগ্রিক পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ 'আনা কারেনিনা' উপন্যাস সম্পর্কে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করলেও কোন কোন সমালোচক মনে করেন তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ছকের ভিতর 'আনা কারেনিনা'-র পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। দুটি উপন্যাসেই ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত। তবে ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা সব দেশের সমাজ-জীবনেই কিছু-না-কিছু ঘটে থাকে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আনা কারেনিনা ও ঘরে বাইরের প্লটের সাদৃশ্য অজ্ঞানকৃত হওয়াই সম্ভব। তবে শিল্পকর্ম হিসাবে

আনা কারেনিনা অনেক বেশী শক্তিশালী। টলস্টয়চর্চাকারী একাধিক সমালোচকের ধারণা, এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যদিও ভিন্নমতাবলম্বী অন্য এক গোষ্ঠীর সমালোচকদের রায়ে রেসারেকশন উপন্যাসের উপরেই এই সম্মান অর্পণ করা হয়।

রেসারেকশন উপন্যাসের কথায় মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের কথা। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস চরিত্রহীন সম্পর্কে এক সময়ে এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বইটি অশ্লীল, কেন না এতে এক পতিতাকে মেসের ঝি করে আঁকা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেদের অবাধ মেলামেশা দেখানো হয়েছে। এই অভিযোগের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে লিখেছিলেন, তাঁদের যদি টলস্টয়ের রেসারেকশন উপন্যাস পড়া থাকতো তাহলে তাঁরা আর ওই ধরনের অসার অভিযোগ আনতেন না। রেসারেকশন উপন্যাস একটি পতিতাকে নিয়ে লেখা, তৎসত্ত্বেও এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা উপন্যাসরূপে রসিকমহলে স্বীকৃত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রেসারেকশন উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'বিচারক' এর প্লটের খানিকটা মিল দেখা যায়। বিচারক গল্পের প্রকাশকাল বিগত শতকের নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি কাল। আর রেসারেকশন প্রকাশিত হয় ওই দশকের একেবারে শেষের দিকে। ফলে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তবে এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতরূপে কিছু বলা কঠিন। কেননা রেসারেকশন পুস্তকাকারে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হলেও এটির রচনাকার্য শুরু হয় ১৮৮৯-১৮৯০ সালে প্রথম দফায়, দ্বিতীয় দফা রচনার কাজ চলে ১৮৯৫-৯৬ সালে এবং তৃতীয় ও শেষ দফায় রচনাকার্য সমাপ্ত হয় ১৮৯৮-৯৯ সালে। এবং যে বাস্তব ঘটনার অবলম্বনে উপন্যাসের আখ্যানভাগ গঠিত হয়েছে সেটি ঘটেছিল ১৮৮৭ সালে, কাজেই পৌর্বাপর্বের বিচারে রেসারেকশন আগে, বিচারক পরে।

('শিল্পকর্মের মূল্যায়ন' অধ্যায়ের "কোনির বিবরণ" প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

টলস্টয়ের কাহিনীর কাটুসা আর রবীন্দ্রনাথের গল্পের ক্ষীরোদার পতিতায় রূপান্তরণ একই কারণসম্ভূত—ভোগী যুবকের লাম্পট্য। তবে যুবা বয়সের দায়িত্বজ্ঞানহীন কামুকতার পরিণামে নারীর স্খলন, গৃহত্যাগ ও পতন সব দেশের সমাজেই কমবেশী আছে। সুতরাং ছকটি বিরল ঘটনার পর্যায়ে পড়ে না। ফলে এই মিল অনভিপ্রেত হওয়াই সম্ভব।

লেনিন ও গর্কির চোখে টলস্টয়

সোভিয়েত বিপ্লবের নায়ক মহামতি লেনিন ও বিশ্ববরেণ্য রুশ সাহিত্যস্রষ্টা ম্যাক্সিম গর্কি দুজনেই ছিলেন সাম্যবাদী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শনের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস তাঁদের নিরীশ্বরবাদী, নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যকারিতায় আস্থাশীল এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উর্ধ্বে বৃহত্তর সমাজকল্যাণকে স্থান দেওয়ার নীতিতে প্রত্যয়ী করে তুলেছিল। তাঁদের চিন্তা তাঁদের ঘোষণা ও আচরণ দুইয়েরই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে গর্কির চলায় বলায় হয়তো কখনও কখনও সাময়িক বিভ্রম ঘটেছে কিন্তু লেনিনের আদর্শ ধ্রুবতারার মত স্থির, অবিকম্প। যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক, তাঁকে তাঁর অটল বিশ্বাসের ভূমি থেকে কোন অবস্থাতেই চ্যুত করা যায়নি।

পক্ষান্তরে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পসাধক ও মহাপ্রাজ্ঞ টলস্টয় ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী, ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের একাধিক 'ডগমা' না মেনেও অন্তরে অন্তরে অবিচল যীশুভক্ত, অহিংসার আদর্শের ক্লান্তিহীন প্রচারক। শুধু তাই নয়, অহিংসা তত্ত্বের একটি বিশেষ দিক অন্যায়ের অপ্রতিরোধ (নন-রেজিষ্ট্যান্স টু ইভিল)— তার সুবিদিত উদ্গাতা, সর্বোপরি, ব্যক্তিমুক্তি ও আত্মশুদ্ধির চেষ্টায় আজীবন স্থিতযত্ন। ঈশ্বরবিশ্বাস টলস্টয়ের কাছে নিঃশ্বাস-বায়ুর মত সহজ ও অপরিহার্য ছিল। কি শিল্পচর্চা কি অন্যবিধ কাজ তার যাবতীয় কর্মের লক্ষ্যে ছিল ঈশ্বর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, এমনকি তাঁর শেষ বয়সের অনুক্ষণ মৃত্যু ভাবনাও ঈশ্বরভাবনার প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছু ছিল না। ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের একাধিক আচার-অনুষ্ঠান তিনি এক সময়ে নিয়মনিষ্ঠভাবে, বলতে গেলে প্রায় নিবিচারে, অনুসরণ করতেন। কিন্তু পরে যুক্তির আলোকে এগুলির অসারতা অন্তরে প্রতীত হওয়ায় তিনি এসব খেদহীন ভাবে বর্জন করেছিলেন। রুশ অর্থোডক্স চার্চের একাধিক 'ডগমা' (গোঁড়া ধারণা) ও 'রিচুয়াল' (আনুষ্ঠানিক প্রকরণাদি) তাঁর নিকট অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, ফলে সেগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তাঁর আটকায়নি। যেজন্য রুশ চার্চ তাঁর উপর কুপিত হয়ে তাঁকে তাদের ধর্মমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। এই শতাব্দীর গোড়াকার দিকের ঘটনা এটি। তবে রুশ চার্চ থেকে বহিষ্কৃত হলেও ক্রীশ্চিয়ান ধর্মের মূলনীতিগুলি থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন ভক্ত ক্রীশ্চিয়ান। যীশুর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। যীশুর

অবতারত্বে বিশ্বাস না করলেও মানুষ হিসাবে যীশু যে এক অসামান্য জ্যোতির্ময় সত্তার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। যীশুর প্রচারিত 'সার্মন অন দি মাউণ্ট' (পর্বতোপরি প্রদত্ত উপদেশমালা) তাঁর জপমন্ত্র স্বরূপ ছিল বললেও চলে। বিশেষতঃ ওই দশদফা উপদেশের পাঁচটি উপদেশ (অক্রোধ, অকাম, শপথ নেওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকা, অপ্রতিরোধ ও সমদর্শিতা) তাঁর দৈনন্দিন পালনীয় বিধিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধি হিসাবে গণ্য ছিল। সকলের উপরে তিনি নিরন্তর আত্মসংশোধন ও আত্মমোক্ষের চেষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে ন্যায়ানুমোদিত নয় এমন বহুতর কাজ করেছিলেন কিন্তু তার জন্য তাঁর অন্তরে যন্ত্রণার ও অশান্তির অন্ত ছিল না। কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতাপের সায়কে আপনাকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করে তার থেকে মুক্তির উপায় তিনি খুঁজতেন এবং এভাবে ক্রমাগত আত্মোন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। ব্যক্তিক পর্যায়ে নিজেকে ক্রমোন্নত করবার জন্য টলস্টয়ের নিরবচ্ছিন্ন অতন্দ্র প্রয়াস তাঁর চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম এবং অধুনা প্রায় লোককথায় পরিণত।

অথচ আশ্চর্য, লেনিন ও গর্কি দুজনেই টলস্টয়ের সাহিত্যকৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। টলস্টয়ের সাহিত্যের বাস্তবতা, শিল্পোৎকর্ষতা, জনগণমুখীনতা, মানবপ্রেম, সমাজকল্যাণ, বিপ্লবের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা—এ সব বিষয়ে উভয়েই তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসাকে ভাষা দিয়ে গেছেন একাধিক প্রশস্তিমূলক রচনায়। গর্কি, অধিকন্তু, টলস্টয়ের ব্যক্তিস্বরূপের বড় চমৎকার রূপরেখা অঙ্কন করে গেছেন তাঁর ডায়েরীধর্মী রচনাগুলিতে এবং শিল্পী-গুরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা এক অনবদ্য শোক-প্রবন্ধে। শোক-প্রবন্ধটি জনৈক বন্ধুকে চিঠির আকারে লিখিত এবং লোকান্তরিতের স্মৃতিচিত্রে ভরপুর।

কিন্তু এঁদের প্রশংসা মানে নির্বিচার প্রশংসা নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রশংসার ভাষায় স্বতঃই সমালোচনার সুর এনে দিয়েছে এবং যেখানে যেখানে টলস্টয়ের চিন্তায় স্বতোবিরোধ আছে তা দেখাতে কুণ্ঠিত হয়নি। এইখানেই লেনিন ও গর্কির টলস্টয় মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মূল্যায়ন স্তুতি নয়, প্রশংসার উচ্ছ্বাস নয়, পরন্তু কঠোর বিচার-সন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ এই দিক দিয়ে লেনিনের বিশ্লেষণ গভীর মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

টলস্টয়ের তিরোধানের সমসময়ে লেনিন ('সোস্যাল ডেমোক্রাট' পত্রিকায়

১৮নং সংখ্যায় (নভেম্বর ১৬ [২৯], ১৯১০) যে-বিয়োগ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা প্রশংসা-সমালোচনার মিশ্র বিশ্লেষণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই রচনাটিতে টলস্টয়ের শিল্পকলার অস্তিবাচক দিকগুলি সম্বন্ধে যেমন লেনিন আন্তরিক প্রশংসায় অবারিত হয়েছেন তেমনি তাঁর চিন্তার পরস্পর-বিরোধিতা এবং রক্ষণশীল ঝোঁকগুলি সম্বন্ধেও তিনি ছেড়ে কথা কননি। রুশ সাহিত্যের বিশাল বটবৃক্ষ সদৃশ এই সর্বস্বীকৃত দিক্‌পাল লেখকের লেনিনকৃত মূল্যায়ন এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, যত বড় প্রতিভাধর মানুষই কেউ হোন না কেন, স্বতোবিরোধের কবল থেকে কারও নিস্তার নেই। দেশ, কাল, বিশেষ সমাজ-পরিবেশ, যাতে লেখকের জন্ম ও বিচরণ—এগুলি স্বতোবিরোধের কারণ রূপে কাজ করে। শিক্ষাদীক্ষার ছাঁচটাও লেখকের মনোগঠনে কম প্রভাব বিস্তার করে না। টলস্টয়ের স্বতোবিরোধ তাঁর দেশকালের বিশেষ গড়ন থেকে যেমন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিশেষ আবেষ্টনীর প্রকৃতি থেকে সঞ্জাত।

২

প্রথমে লেনিনের কথা ধরা যাক।

টলস্টয় তাঁর জীবদ্দশাতেই 'ঋষি টলস্টয়' রূপে পূজিত হতে আরম্ভ হয়েছিলেন। এই অভিধারই আনুষঙ্গিক রূপে আর একটি বিশেষণ তাঁর উপর প্রয়োগ করা হতো—'বিশ্বের জাগ্রত বিবেক'। অর্থাৎ কিনা বিশ্ববাসীর সম্মিলিত বিবেকের তিনি প্রতিমূর্তি। বিশ্ব-বিবেকের কণ্ঠস্বর। এই বিশেষণটি সম্পর্কে লেনিনের আপত্তি। আপত্তি এ কারণে নয় যে ওই বিশেষণটিরই নিজস্ব কোন গলদ আছে, আপত্তি এজন্য যে, টলস্টয়ের চিন্তার যেটা অগ্রগামী দিক—সমস্ত রকমের শ্রেণী-আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র প্রতিবাদের মধ্যে তাঁর যে প্রগতিশীল ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়—তাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তাঁর নৈতিক আত্মশুদ্ধির ধারণাকে, যেটা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, যার সঙ্গে জনগণের মঙ্গলের কোন সম্পর্ক নেই। পুরাতনকালীন ও মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সন্ত-সাধুদের ধরনে ব্যক্তিগত আত্মশোধনের চেষ্টা অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে টলস্টয়ের অতীতমুখিতাকেই প্রমাণ করে, ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সঞ্জীবক উপাদান রূপে টলস্টয় সাহিত্যের যে বিশেষ মূল্যবান উপ-যোগিতা রয়েছে সেই দিকটাকে এ জিনিস আদৌ চিহ্নিত করে না বরং এর প্রতিকূল প্রেরণা রূপে কাজ করে।

অথচ টলস্টয়ের রচনাবলীকে এই লেনিনই বলেছেন, "রুশ বিপ্লবের দর্পণ"।

কেন বলেছেন তার হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। লেনিনের জবানীতেই এ কাজ করা ভাল। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন—

"এল এন টলস্টয় মহান শিল্পী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন এক সময়ে যখন দেশে ভূমিদাস প্রথার আধিপত্য বজায় ছিল। তাঁর অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পর পর কয়েকটি মহান সৃষ্টিতে প্রধানতঃ ১৮৬১ সালের পরবর্তী কালের আধা ভূমিদাস প্রথার প্রভাবাধীন পুরাতন প্রাক্-বিপ্লব যুগের যে রাশিয়ার চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন—সে রাশিয়া হলো ভূস্বামী এবং কৃষকের গ্রামীণ রাশিয়া। টলস্টয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনেকগুলি বিরাট সমস্যা উত্থাপন করেছেন এবং শৈল্পিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের মহত্তম কৃতিত্বগুলির সঙ্গে এক সারিতে স্থান লাভ করেছে। ভূমিদাস মালিকদের দ্বারা নিপীড়িত একটি দেশে বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগটি টলস্টয়ের উজ্জ্বল আলোক সম্পাতের ফলে সমগ্র মানবতার শৈল্পিক বিকাশে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে।"

ওই একই প্রবন্ধে লেনিন এর কিছু পরে লিখছেন—

"টলস্টয় শুধুমাত্র শিল্পকৃতিই রচনা করেননি।······তিনি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার দ্বারা নিপীড়িত বিশাল জনগণের মনোভাব এবং তাদের প্রতিবাদ ও ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। টলস্টয় ছিলেন প্রধানতঃ ১৮৬১—১৯০৪ যুগের মানুষ। তাই তিনি তাঁর রচনাবলীতে শিল্পী এবং চিন্তাবিদ্ ও প্রচারক উভয় রূপেই প্রথম রুশ বিপ্লবের গোটা যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিস্ময়কর স্পষ্টতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন—বিপ্লবের শক্তি ও দুর্বলতা দুইকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।"

টলস্টয়ের মত বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কৃষক জীবনের এমন সার্থক রূপকার আর দেখা যায় না। রুশ কৃষকের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন দুইই তাঁর লেখায় নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত। তাঁর সাহিত্যে রুশ অভিজাত জীবনের ছবি এসেছে ওই কৃষকেরই শ্রমে উৎপন্ন সম্পদের ভোগী এক অলস বিলাসী পরগাছা সম্প্রদায়ের ছবি রূপে। এই অভিজাত সম্প্রদায় থেকে সেনাবাহিনীর অফিসারদের সংগ্রহ করা হতো। তাদের রসদের উপকরণ যোগাতো কৃষকেরা। বস্তুতঃ গোটা সৈন্যবাহিনীর রসদই আসতো গ্রাম থেকে—চাষীর রক্ত জল করা পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসল নামমাত্র মূল্যে আত্মসাৎ করে নিত সৈন্যবিভাগের খাদ্য সংগ্রাহকের দল। মস্কো, সেণ্ট পীটার্সবার্গ প্রভৃতি রাজধানী শহরগুলির রাজকীয় আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের সমারোহ, বিলাস-ব্যসনের প্রাকার সবটাই তৈরী হয়েছিল যুগ যুগ ধরে

গ্রামীণ ম্যুজিকদের পরিকল্পিত শোষণ ও নিঃস্বকরণের মধ্য দিয়ে। গ্রামের কুলাকদের ধনসম্পদের স্ফীতির মূলেও ছিল গ্রামের ম্যুজিকদের নির্বিবেক লুণ্ঠন ও তিল তিল ধ্বংসসাধন।

টলস্টয় তাঁর গল্পোপন্যাসে বিচিত্র ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে উপযুক্ত কাহিনী সৃষ্টি করে রুশ কৃষিজীবনের আলেখ্যই মূলতঃ অঙ্কন করেছেন। কৃষকের শক্তি ও দুর্বলতা, ক্ষোভ ও বঞ্চনা, রোষ ও ক্রোধ একজন প্রকৃত বাস্তববাদী লেখকের ন্যায় চিত্রিত করেছেন তাঁর লেখায় গভীর সত্যনিষ্ঠায়। কৃষকেরা তাদের হীনাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মাঝে মাঝে আন্দোলন করেছে, কখনও কখনও বিদ্রোহ করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি—তাদের সেই আন্দোলন ও বিদ্রোহ ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করেছে জারের সৈন্যরা স্থানীয় জমিদারের লোক-লস্করের সহায়তায়। আমাদের দেশের যুগ যুগ পীড়িত চাষীদের মতই বিপ্লবপূর্ব রুশ কৃষকদের দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টীয় বিশ্বাস দ্বারা লালিত এক সত্য অথবা কাল্পনিক ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তারা এ-জন্মের সকল জ্বালা জুড়োবার চেষ্টা করত।

এই তো হলো উনিশ শতকের শেষার্ধের রুশ কৃষকের হাল। রাশিয়ায় তখনও শিল্পায়িতকরণের পদপাত ঘটেনি। টলস্টয় পরম সততায় বাস্তবের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততা অক্ষুন্ন রেখে, এই লাঞ্ছিত ও অপমানিত কৃষকের জীবনই তুলে ধরেছেন তাঁর বিশাল সাহিত্যের আধারে। কৃষক আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা তাঁর লেখায় শিল্পীর হৃদয়বত্তা ও অব্যভিচারী বস্তুনিষ্ঠায় জড়াজড়ি-মেশামেশি হয়ে প্রতিফলিত। লেনিন টলস্টয়ের রচনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি অঙ্গুলিক্ষেপ করে তাঁর পূর্বোল্লিখিত সোস্যাল ডেমোক্রাট পত্রিকার প্রবন্ধে লিখেছেন—

"......কৃষক জনসাধারণের আন্দোলনের যুগপৎ শক্তি ও দুর্বলতা, পরাক্রম ও সীমাবদ্ধতাই টলস্টয়ের রচনাবলীতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বহুশতাব্দীব্যাপী ভূমিদাসপ্রথা, সরকারী উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন, গির্জার জেস্যুইট মতবাদের প্রতারণা ও শঠতা ইত্যাদির দরুণ কৃষকদের মনে পর্বতপ্রমাণ ক্রোধ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের ও পুলিশের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা সরকারী গির্জার বিরুদ্ধে উত্তপ্ত আবেগপূর্ণ এবং অনেক সময় নির্মম ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের দ্বারা টলস্টয় সেই আদিম কৃষক গণতান্ত্রিক জনসাধারণেরই মনের কথাকে ভাষা দিয়েছেন। জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন প্রতিবাদ সমসাময়িক ঐতিহাসিক যুগের কৃষকদের মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন। সেই যুগের জমির পুরাতন মধ্যযুগীয় মালিকানা

তার উভয় রূপেই, অর্থাৎ বড় বড় জমিদারী ও রাষ্ট্রের দ্বারা 'পত্তন' দেওয়া জমি দেশের অগ্রগতির পথে সুনিশ্চিত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং এই পুরাতন মালিকানা অনিবার্যরূপে নির্মম আঘাতে ধ্বংস হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছিল। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে টলস্টয়ের অভিযোগ ছিল বিরামহীন, গভীরতম অনুভূতি ও আন্তরিক ঘৃণায় ভরা। তা ছিল, এই নতুন, অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য শত্রুর সম্বন্ধে পিতৃসত্তামূলক কৃষকের আতঙ্কের অভিব্যক্তি।"

অন্যত্র টলস্টয়ের সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত মহিমা ও শিল্পোৎকর্ষ এই দুইয়েরই প্রসঙ্গ এককালীন আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন—

"টলস্টয় শুধু এমন সাহিত্যই সৃষ্টি করেননি যা রুশ জনগণ জমিদার আর পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে তাদের নিজেদের বসবাসের উপযুক্ত মানবিক অবস্থা সৃষ্টির পরও অনন্ত কাল ধরে সমাদর ও অধ্যয়ন করতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও একটা কাজ করেছিলেন। তিনি অসামান্য ক্ষমতায় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা প্রপীড়িত জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের অনুভূতি আর আবেগকে চিত্রিত করেছেন, তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের অন্তরস্থিত স্বতোৎসার প্রতিবাদ আর ক্রোধের মনোভাবকে করেছেন প্রকাশ।"

প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাতেও লেনিন সমান মুক্তকণ্ঠ ছিলেন সে কথা পূর্বেই বলেছি। টলস্টয়ের আত্মশুদ্ধি ও ব্যক্তিমুক্তির ধারণার বিরুদ্ধে লেনিনের অভিমত প্রবন্ধের সূচনায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে অন্যান্য বিষয়ে লেনিনের আপত্তি তুলে ধরা হচ্ছে।

টলস্টয়ের অগ্রগামী, প্রগতিশীল বিপ্লবের সহায়ক ভূমিকার সবিশেষ সপ্রশংস মন্তব্য করেই লেনিন থেমে থাকেননি, পরক্ষণেই বলেছেন—

"কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ওই তীব্র প্রতিবাদকারী, আবেগদীপ্ত অভিযোগকারী মহান সমালোচকের রচনাবলীতে দেখা যায় যে, তিনি রাশিয়ার আসন্ন সংকটের কারণ বুঝতে এবং তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা ছিল শুধু পিতৃসত্তায় স্থিত অনভিজ্ঞ কৃষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকের নয়। সামন্তযুগীয় পুলিশী রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম পর্যবসিত হলো, রাজনীতি বর্জনে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধের মতবাদে এবং ১৯০৫-১৯০৭ সালে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে সরে থাকায়।* সরকারী গির্জার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের সঙ্গে মিলিত হলো এক নতুন

* ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় বিপ্লবীরা টলস্টয়ের কাছ থেকে সক্রিয় সমর্থন, ভদ্রভাবে নৈতিক সমর্থন অন্ততঃ আশা করেছিলেন। কিন্তু টলস্টয় তাঁদের

বিশুদ্ধ ধর্মের প্রচার অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণের মনে এক নতুন পরিশোধিত সূক্ষ্ম বিষ সঞ্চার করা। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা তাঁকে প্রকৃত শত্রু অর্থাৎ ভূস্বামী প্রথা ও তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেনি। তাঁর প্রতিবাদ পর্যবসিত হয়েছে স্বপ্নালু, ধোঁয়াটে এক পঙ্গু বিলাপে, পুঁজিবাদ ও তার দ্বারা জনগণের উপর চাপানো বিষয়গুলির মুখোস উন্মোচনের সঙ্গে মিশে রয়েছে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বজোড়া মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ মনোভাব।" (সোশ্যাল ডেমোক্রাট, ১৯ নভেম্বর ১৯১০)

কিন্তু লেনিন টলস্টয়ের এই স্ববিরোধী ভূমিকায় আশ্চর্য হননি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ১৮৬১ সালের ভূমিসংস্কার এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবচেষ্টার মধ্যবর্তী সময়ে রাশিয়ার যে বিশেষ পরিস্থিতি ছিল—বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে অত্যন্ত জটিল ও পরস্পর বিরোধী মানসিকতার সংঘাত জনিত অবস্থা, যার পিছনে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দুই ধরনের কারণই ছিল—তাতে টলস্টয়ের পক্ষে এই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তিনি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বময় যুগটাকেই প্রতিফলিত করেছেন তাঁর চিন্তায়। তিনি লিখেছেন—

"টলস্টয়ের মতবাদে ও তত্ত্বচিন্তায় যে স্ববিরোধ রয়েছে তা আকস্মিক নয়। ঊনিশ শতকের শেষ পাদকে রাশিয়ার সমাজে ও জীবনে যে স্ববিরোধী অবস্থা বিদ্যমান ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে টলস্টয়ের ওই স্ববিরোধের মধ্যে।···টলস্টয়ের স্ববিরোধ প্রকৃতপক্ষে সেই সব স্ববিরোধী অবস্থারই দর্পণ স্বরূপ, যে অবস্থার ভিতর থেকে রাশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়কে আমাদের বিপ্লবে (কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লবে) তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল।"

পরিশেষে লেনিন-কৃত টলস্টয় মূল্যায়নকে লেনিনের ভাষাতেই সার-সংক্ষেপ করছি। এক চমৎকার বিপরীতের সহাবস্থান মূলক বর্ণনায় লেনিন টলস্টয়ের অস্তি ও নাস্তির দিকগুলিকে একত্র সংবদ্ধ করে দেখিয়েছেন এইভাবে—

"টলস্টয়ের রচনাবলীতে, মতামতে, চিন্তায়, তাঁর ঘরানার ভাবধারায় যে পরস্পর বিরোধিতাগুলি রয়েছে তা বাস্তবিকই প্রকট। একদিকে আমরা

সম্পূর্ণ নিরাশ করেছিলেন। সমর্থন দেওয়া দূরে থাক, প্রকৃত পক্ষে তিনি বিপ্লবের বিরোধিতাই করেছিলেন। টলস্টয়ের জীবনী লেখক চার্লস সারোলিয়া লিখেছেন, সেই সময়ে রাশিয়ার জনগণের কাছে সর্বাধিক ধিকৃত মানুষ ছিলেন টলস্টয়। বিপ্লবীরা এজন্য তাঁকে কখনই ক্ষমা করতে পারেননি। —লেখক।

পাচ্ছি এক মহৎ শিল্পীকে, এক প্রতিভাকে, যিনি রুশ জীবনের অতুলনীয় সব ছবিই শুধু আঁকেননি, বিশ্বসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অবদানও রেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদিকে পাচ্ছি এক ভূস্বামীকে, যিনি খৃষ্ট ভাবনায় আচ্ছন্ন। একদিকে সামাজিক মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অসম্ভব বলিষ্ঠ সুস্পষ্ট ও আন্তরিক প্রতিবাদের উদ্‌ঘোষণ; অন্যদিকে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান এক পাংশুজীর্ণ ভাবাবেগের উৎক্ষেপ যুক্ত বিলাপময় রুশ বুদ্ধিজীবী (যাকে বলা হয় 'টলস্টয়ান' অর্থাৎ টলস্টয় মতবাদের বাতিক সম্পন্ন), যিনি প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি অতি খারাপ, দুষ্ট প্রকৃতির লোক কিন্তু আমি নৈতিক আত্মশুদ্ধির ব্যায়ামে রত।' একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারী স্তরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, বিচার প্রহসন আর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গলদ-সমূহের উদ্‌ঘাটন এবং ঐশ্বর্যের স্ফীতি ও সভ্যতার কৃতিত্বগুলির সঙ্গে তুলনায় তারই পাশাপাশি বর্তমান শ্রমজীবী জনসাধারণের চূড়ান্ত রকমের দারিদ্র, হতদশা ও দুঃখের গভীর বৈপরীত্যের মুখোস খুলে ধরা। অন্যদিকে 'হিংসার সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিরোধ করো না' এই অবিরত প্রচার। একদিকে শ্রেষ্ঠ স্থিরবুদ্ধি যুক্ত বাস্তব প্রকাশ এবং সর্বপ্রকার কাপট্যের ছায়াবরণ ছিঁড়ে ফেলা; অন্যদিকে দুনিয়ার অতিশয় ঘৃণ্য বস্তুগুলির অন্যতম ধর্মের প্রচার, সরকার নিযুক্ত যাজকদের জায়গায় তথাকথিত নৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা চালিত যাজকদের অভিষিক্তকরণ অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু সবিশেষ বিরক্তিকর যাজকতন্ত্রের চর্চা।"

লেনিন তাঁর 'লিও টলস্টয় ও তাঁর যুগ' প্রবন্ধে টলস্টয়ের চিন্তাদর্শনের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করেছেন এইভাবে—

"টলস্টয়ের মতবাদ নিশ্চয়ই কল্পরাজ্যকামী (ইউটোপিয়ান) এক ভাবুকতা এবং বক্তব্যের দিক থেকে কথাটি সঠিক এবং গভীর অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মতবাদটি সমাজতান্ত্রিক নয় বা তার ভিতর সমালোচ-নাত্মক উপাদান নেই—এমন সব উপাদান যেগুলি অগ্রসর শ্রেণীগুলির চেতনা বিকাশে মূল্যবান উপকরণের কাজ করতে পারে।…টলস্টয়ের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মতবাদে সমালোচনাত্মক উপাদান অনুস্যূত রয়েছে, যেমন আর সব কাল্পনিক মত-বাদের চিন্তাধারায় এন্বিতর সমালোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমাদের মার্কসের এই সুচিন্তিত অভিমত ভুলে গেলে চলবে না যে, কাল্পনিক সমাজবাদের অন্তর্নি-হিত সমালোচনার ভাবগুলি 'ঐতিহাসিক অগ্রগতির ছন্দের সঙ্গে বিপরীত সম্বন্ধে আবদ্ধ'। নবায়মান রাশিয়ার রূপকার বর্তমানের সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমানে সমাজে যে সব অহিতকর প্রভাব রয়েছে সেগুলির কবল

থেকে দেশকে মুক্ত করে যত বেশী সুগঠিত ও সংহত চরিত্র লাভ করছে, ততই দ্রুততার সঙ্গে সমালোচনাত্মক কাল্পনিক সমাজবাদী চিন্তাধারা তাদের বাস্তব মূল্য এবং তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা হারাচ্ছে।"

টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের সদর্থক ও নঙর্থক দিকগুলির এমন এককালীন স্পষ্ট উচ্চারণ, এক কথায় তাঁর সামগ্রিক সত্তার স্ব-স্বরূপের এমন নিরপেক্ষ উন্মোচন শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত অথচ শিল্প-সাহিত্যের গভীর অনুসন্ধিৎসু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী লেনিনের লেখনীতে ছাড়া আর কার লেখাতেই বা সম্ভব হতে পারতো ?

এত সব সত্ত্বেও লেনিন টলস্টয়কে বলেছেন—"বনস্পতি সদৃশ পুরুষ"। গর্কির বর্ণনা থেকে লেনিনের টলস্টয় মূল্যায়ণের এই দিকটি তুলে ধরে লেনিন-প্রসঙ্গের ইতি ঘটাচ্ছি।

একদিন গর্কি লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন টেবিলে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বইটি পড়ে আছে। গর্কিকে দেখে লেনিন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং কোনরূপ ভূমিকা না করে গর্কির সঙ্গে টলস্টয় সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করলেন। গর্কি লিখছেন—

"তিনি মৃদু হেসে চোখ কুঁচকোলেন, আরাম-আয়েস করে ছড়িয়ে বসলেন, তারপর গলার স্বর নীচু করে দ্রুত বলতে লাগলেন :

" 'কত বড় মানুষ ! কী অসামান্য বিশালতা ! এই হলো যাকে বলে সত্যি-কারের শিল্পী।...আর এটা কি আপনার কখনও খেয়াল হয়েছে ? এই অভিজাত কাউণ্টের আগে সাহিত্যে প্রকৃত একজন মুজিকের দেখা মেলেনি কখনও ?'

"তারপর কুঞ্চিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিজ্ঞাসা করলেন :

" 'ইউরোপে এমন কে আছে যাঁকে, তাঁর সমপর্যায়ে স্থাপন করা যায় ?'

"তারপর তিনি নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

'কেউ না।'

"বলে হাত ঘষতে ঘষতে তিনি তৃপ্তির হাসি হাসলেন।"

টলস্টয়ের সঙ্গে গর্কির প্রথম সাক্ষাৎকার এই শতাব্দীর গোড়াকার দিকে (১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে) মস্কোস্থিত টলস্টয়ের গৃহে। তারপর পুনরায় তাঁদের দেখা হয় ক্রিমিয়ার গ্যাসপ্রা শহরে। ১৯০১ সালে। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এই সুন্দর স্বাস্থ্য-নিবাসে টলস্টয় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও মানসিক বিশ্রাম

লাভে গিয়েছিলেন। নিত্য তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো, কথাবার্তা হতো। সে সময় গর্কি এবং শেখভ একযোগে টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্থলের—একজন চিত্রশিল্পী। গর্কি এই সাক্ষাৎকারের চমৎকার বর্ণনা রেখে গেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

টলস্টয়ের পক্ষে সেই সময়টা ছিল দুঃসময়। তাঁর বিপ্লব বিরোধিতার জন্য তিনি তখন রাশিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। রুশ জনগণের চোখেও তাঁর সমাদর, অন্তত কিছুকালের জন্য, কমে গিয়েছিল। ততদিনে রুশ সাহিত্য গগনে এক নতুন তারার উদয় হয়েছে। তার নাম ম্যাক্সিম গর্কি। রাশিয়ার নবীন পাঠক সমাজ তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে এবং উষ্ণ অভিনন্দনে অভিনন্দনে তাঁকে প্রাণপ্রিয় লেখকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 'ঝড়ের পাখির' স্রষ্টার সে কী সংবর্ধনা! জনগণের মধ্যে তাঁকে নিয়ে কী অভূতপূর্ব মাতামাতি। গর্কি জনপ্রিয়তার কোন্ তুঙ্গে পৌছেছিলেন বোঝাবার জন্য এই বলাই যথেষ্ট যে, সাধারণের বন্দিত ওই নবীন লেখক যখন একবার দক্ষিণ রাশিয়ার কোন এক শহর থেকে বিদায় নিতে উদ্যত তখন তাঁর সম্মানে বিদায় অনুষ্ঠানের ঢল বয়ে গিয়েছিল, এমনকি তাঁর প্রস্থান লগ্নে কামান থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল!

সুতরাং বৃদ্ধ শিল্পী-গুরু আর তরুণ সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মনোভাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সে কথা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। শক্তিমান নবীনের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবীণের স্নেহভাবের সঙ্গে ঈর্ষার ভাবও যে কতকটা জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে এ কথা সাহিত্যজগতে অন্ততঃ সুবিদিত। গর্কি নিজেই জানিয়েছেন রুশ সাহিত্যের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ সর্বস্বীকৃত পিতামহকল্প এই প্রতিনিধি তাঁকে প্রথমটায় তেমন প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু গর্কি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা, প্রগাঢ় মানবীয় বোধের দ্বারা বৃদ্ধের এই প্রাথমিক বৈরীভাব জয় করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁকে নিতান্ত স্নেহবৎসল অনুরক্ত এক শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকে পরিণত করে তুলেছিলেন। শেখভ, স্থলেরজিৎস্কি এবং গর্কি নবীন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে এই তিনজনকে টলস্টয় বিশেষ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং যখনই তাঁদের সঙ্গে দেখা হতো ত্রয়ী বন্ধুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। সকলেই তাঁরা সাহিত্যের মানুষ হলেও সাহিত্যই তাঁদের একমাত্র আলোচ্য ছিল না। টলস্টয়ের তখন বার্ধক্যের পর্ব—নিছক শিল্পীর ভূমিকা থেকে ততদিনে তিনি 'ঋষির' পদবীতে উন্নীত। সুতরাং আলোচনা মাঝে মাঝে

অবধারিত রূপেই সাহিত্যকে ছাপিয়ে নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির গভীরে প্রবেশ করত। সে সবের প্রতি গর্কির তেমন রুচি ছিল না এবং কখনও কখনও "কর্তার" নিকট তাঁর অপছন্দ খোলাখুলি ব্যক্ত করতেও তিনি ছাড়তেন না।

টলস্টয়ের সঙ্গে কথোপকথন গর্কি ছেঁড়া ছেঁড়া ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেগুলি একদা হারিয়ে গিয়েছিল, তার কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করে পরে তিনি প্রকাশ করেন। শিল্পী-গুরুর গৃহ থেকে অন্তর্ধান ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গর্কি এক নাতিদীর্ঘ অসমাপ্ত চিঠিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে গেছেন রাশিয়ার এই সর্বকালের দিক্‌পাল বয়োজ্যেষ্ঠ কথাকারের উদ্দেশে। সুগভীর ভাবাবেগ মণ্ডিত সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যের ভাষা। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর গর্কির মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তাকে তিনি সংক্ষিপ্ত দুটি বাক্যে অতিশয় মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ করেছেন—"আমার হৃৎপিণ্ডে এক প্রচণ্ড আঘাত এসে লাগলো। ব্যথায় ও শোকে আমি কেঁদে উঠলাম।"

এই থেকেই বোঝা যায় গুরুকে শিষ্য কী গভীর ভালবাসায় ও শ্রদ্ধায় চর্চিত করে তাঁর সান্নিধ্যের অনুশীলন করতেন। অথচ, গোড়াতেই বলেছি, রাষ্ট্রিক বিশ্বাসে তাঁদের দুইয়ের মধ্যে সামান্যই মিল ছিল। একজন ব্যক্তিবাদী, অন্যজন কম্যুনিষ্ট। একজন গভীর আস্তিক্যবুদ্ধির অনুসারী, অন্যজন নাস্তিক। একজন অহিংসা মন্ত্রের সাধক, অন্যজন সশস্ত্র বিপ্লবের তন্ত্রে বিশ্বাসী। তবে এসব বিষয়ে যত অমিলই থাকুক, দুইয়ের বিচরণের ক্ষেত্র এক—সাহিত্য। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, কথা সাহিত্য। এই ক্ষেত্রে বয়সের প্রভূত তারতম্য থাকা সত্ত্বেও উভয়েই রুশ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত—একজন প্রবীণ প্রজন্মের প্রতিনিধি, অন্যজন নবীন প্রজন্মের। বলা নিষ্প্রয়োজন সাধনার এই ঐক্য, প্রতিভার এই 'সামান্য লক্ষণ' উভয়কে উভয়ের নিকটতর করে তুলেছিল। এই নৈকট্যের চিরন্তন বিচ্ছেদেই গর্কির ওই মর্মন্তুদ ক্রন্দন।

গ্যাসপ্রায় থাকার সময়ের কিছু স্মৃতিচিত্র। আমি গর্কির ডায়েরী থেকে হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি—

"স্পষ্টতঃই যে ভাবটি অন্য সব ভাব অপেক্ষা তাঁর মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তা হলো ঈশ্বরের চিন্তা। সময় সময় এই চিন্তা ভাব বলেও মনে হয় না, মনে হয় এমন কিছুকে তিনি মনে মনে সজোরে প্রতিরোধ করতে চাইছেন যার দ্বারা তিনি অধিকৃত বলে তাঁর ধারণা। ঈশ্বরের বিষয়ে তিনি যতটা বলতে পারলে খুশী হন ততটা সব সময় বলেন না, কিন্তু অবিরত এই নিয়েই তিনি ভাবছেন। আমার মনে হয় না যে এটা বার্ধক্যের লক্ষণ, অথবা মৃত্যুভয় এর কারণ; খুব সম্ভব

চমৎকার এক মানবীয় গর্ববোধে এর জন্ম। সম্ভবতঃ এর পিছনে এই আঘাতের বেদনাও আছে যে, তিনি, লিও টলস্টয়, তাঁকেও অসহায়ভাবে এক অদৃশ্য মৃত্যু-কীটের শিকার হতে হবে একদিন।"

"তার হাত দুটি অসামান্য—কুৎসিত, মোটা মোটা শিরায় কিম্ভূত, অথচ কী গভীর শক্তিমত্তার প্রকাশক, সৃজনী ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। খুব সম্ভব লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির এই রকমের হাত ছিল। এমন হাতের দ্বারা যে কোন কাজ করা যেতে পারে।"

"তিনি সেই সব তীর্থযাত্রীদের কথা মনে করিয়ে দেন, যাঁরা দণ্ড হাতে পৃথিবী পরিক্রমা করেন, গোটা জীবন ধরে তাঁদের এই পরিক্রমা চলে—এক মঠ থেকে অন্য মঠে, এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে—সাংঘাতিক রকমের গৃহহীন, সবার এবং সব কিছুর থেকে বিযুক্ত। সংসার তাঁদের জন্য নয়, এমন কি ঈশ্বরও তাঁদের জন্য নন। তাঁরা অভ্যাসবশে ঈশ্বরের ভজনা করেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে ঘৃণা করেন। কেন ঈশ্বর তাঁদের পৃথিবীময় ঘুরিয়ে বেড়ান? কেন, কেন?"

"তাঁর প্রিয় আলোচনার বিষয় হলো তিনটি: ঈশ্বর, রুশ কৃষক এবং নারী। সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি খুব কমই মুখ খোলেন, খুললেও অল্পস্বল্প—যেন বিষয়টি তাঁর অপরিচিত। এবং নারীজাতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যতদূর আমার মনে হয়, অবিমিশ্র প্রতিকূলতার। তাঁদের শাস্তি দিতে পারলে তিনি আর কিছু চান না, অবশ্য তাঁরা কিটি কিংবা নাটাশা রস্টোভার মত সাধারণ নারী নন। নারীজাতির প্রতি এই বিরোধিতা, এটা কি জীবন থেকে যতটা সুখ পাওয়ার যোগ্য তিনি ছিলেন ততটা সুখ না পাওয়া এক পুরুষের প্রতিহিংসাচরণ, অথবা আত্ম-অবমাননাকর রক্তমাংসের কামনার প্রতি অন্তরের বিরুদ্ধাচরণ? এটা যাই হোক, এটা শত্রুতা এবং খুবই তিক্ত শত্রুতা। যেমনটা 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।"

" 'আমরা জানি' এ কথা যখন আমরা বলি তখন আমরা কী বোঝাই? আমার কথাই ধরি না কেন। আমি জানি আমার নাম টলস্টয়, আমি একজন লেখক, আমার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে, আমার চুল পেকেছে, মুখের চেহারা কদাকার, মুখ দাড়িময়। আমার পাসপোর্টে এ সব বৃত্তান্ত লেখা আছে। কিন্তু পাসপোর্টে আমার আত্মার কথা নেই। আমার আত্মা সম্বন্ধে একমাত্র আমিই জানি যে, আমার আত্মা ঈশ্বরের নৈকট্য চায়। কিন্তু ঈশ্বর কী? ঈশ্বর তাই, আমার আত্মা যার একটি অণুভগ্নাংশ মাত্র। এছাড়া ঈশ্বরের আর কোন পরিচয়

হয় না। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝা যাবে না, বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে হয়।"

"তাঁর প্রচারের একঘেয়েমি সত্ত্বেও এই অবিশ্বাস্য মানুষটি অনন্যসাধারণভাবে চৌকস।"

"তাঁকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত মেলে না। কিন্তু তাঁকে ঘন ঘন দেখতে চাওয়ার ঝুঁকিও আছে। আমার কথা যদি বল, আমি টলস্টয়ের সঙ্গে এক গৃহে কোনমতেই বাস করতে চাইব না, এক ঘরে তো কদাপি নয়। তাঁর সঙ্গে থাকার অর্থ এমন এক সমতল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা যেখানকার সবকিছু সূর্যের খরতাপে পুড়ে গেছে এবং যেখানে সূর্য নিজেও পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সামনে চিরন্তন অতল রাত্রির বিভীষিকা তৈরী ক'রে।"

ডায়েরী থেকে পূর্বোক্ত শোক-পত্রের এলাকায় এলে দেখা যায়, এই পত্রটি ডায়েরীর লেখাগুলির ছাড়া ছাড়া টুকরো টুকরো স্মৃতি চিত্র নয়, এটি একটি প্রবন্ধের ধরনে লেখা, ধারাবাহিকতায় বিধৃত, যদিও আকারে অসম্পূর্ণ। রচনাটি গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত। এই আপ্লব অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ শিল্পী-গুরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এটি লেখা। বিয়োগ-নিবন্ধের সমস্ত লক্ষণই এতে বর্তমান। আবেগের আতিশয্য, সাময়িকতার পীড়ন, স্মৃতির চাপ এবং অতিশয়োক্তি, শোকজনিত ভারসাম্যের অভাব থেকে যা সঞ্জাত বলে মনে হয়। তবু প্রবন্ধটি তার সীমাবদ্ধতা নিয়েও তুলনাহীন। লেনিনের মত তীব্র ভাষায় না হলেও এতেও সমালোচনা আছে। প্রশংসায় ও সমালোচনায় মিলে জগদ্বরেণ্য লেখক টলস্টয়ের একটি উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি লেখাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে অনুপম রূপে ও রেখায়। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে।

"মানুষটার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যাতে করে আমার চিৎকার করে বলতে সাধ হয় : দেখ, দেখ, কী এক আশ্চর্য মানুষ আমাদের এই গ্রহে বাস করছেন। কারণ তিনি বলতে গেলে সর্বব্যাপী, অপিচ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ একজন মানুষ—'মানুষ' কথাটা তার যথার্থ অর্থে এখানে প্রযোজ্য।"

"কিন্তু আমি কোন সময়েই তাঁর 'কাউন্ট লিও নিকোলায়েভিচ টলস্টয়' থেকে 'সন্ত-সাধু ফাদার টলস্টয়ে' আপনাকে রূপান্তরিত করবার একগুঁয়ে গাজুরি চেষ্টাকে ভালমনে নিতে পারিনি। তিনি জোর করে নিজেকে কষ্ট দিতে চান বলে আমার মনে হয়েছে—সেই দিকেই তাঁর সমস্ত চেষ্টার ঝোঁক। তাঁর আত্মিক শক্তিকে পরখ করবার স্বাভাবিক ইচ্ছা থেকেই যে কেবল আপনাকে কষ্ট দিতে

চান তাই নয়, কিন্তু, আমি আবারও বলছি, পরিষ্কার এক গাজুরি মতলব থেকে তিনি নিজের উপর এই দুঃখের ভর সওয়াচ্ছেন। সে মতলব হলো তাঁর মতবাদের দাম বাড়ানো, তাঁর প্রচারকে অপ্রতিরোধ্য করা, কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাকে জনচক্ষে পবিত্রতায় মণ্ডিত করবার চেষ্টা করা, এবং তাদের ওই মত গ্রহণে বাধ্য করা। হাঁ, বাধ্য করা।"

"যথার্থ সংজ্ঞার্থে একজন জাতীয় লেখক তিনি। রুশ জাতির সমস্ত খারাপ গুণগুলির প্রতীক। ইতিহাসের নিষ্পেষণ আমাদের উপর যত অঙ্গচ্ছেদের দুঃখ চাপিয়েছে তিনি তাকে নিজ আত্মায় ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর সত্তার প্রত্যেকটি তন্তু জাতীয় এবং তাঁর গোটা মতবাদ নিছক প্রতিক্রিয়া ও একটা পিতৃতন্ত্র (অ্যাটাভিজম), যে প্রতিক্রিয়া তথা পিতৃতন্ত্র আমরা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছি, জয় করবার চেষ্টা করছি।"

(গর্কির প্রতি টলস্টয়): "তুমি একজন সত্যিকারের ম্যুজিক। লেখকদের দঙ্গলে তোমার কপালে অনেক ভোগান্তি আছে কিন্তু কেউ যেন তোমাকে ভয় দেখাতে না পারে। যা অনুভব করবে, তাই সর্বদা বলবে, যদি সেটি কখনও কখনও রূঢ়মত শোনায় তাতে পেছপা হবে না। বুদ্ধিমান লোকেরা তোমাকে বুঝবে।"

(টলস্টয়-প্রশস্তি, ম্যুজিকের ধরনে): "আপনিই তিনি? আজ আমার জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তানের দর্শন লাভ করে আমি ধন্য হলাম। প্রণাম, প্রণাম, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

(টলস্টয়-সম্ভাষণ, রুশ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর ধরনে): "লিও নিকোলায়েভিচ, আপনার ধর্মীয় ও দার্শনিক মতামত আমি সমর্থন করি না, কিন্তু আপনার শিল্পী সত্তার বিশালতাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।" বলা বাহুল্য, শেষোক্ত সম্ভাষণ টলস্টয়ের প্রতি গর্কির সম্ভাষণের প্রতিরূপক। (গর্কির উদ্দেশে): "তুমি সর্বদাই বল—সৌন্দর্য, সৌন্দর্য। সৌন্দর্য আসলে কী? সবচেয়ে উঁচু পূর্ণতম ধারণা হলো—ঈশ্বর।"

"তিনি এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে ইতঃপূর্বে খুব কমই আলোচনা করেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব, তার আকস্মিকতা আমাকে চকিত করে তুললো, আমার অভি-ভূত হবার মতো অবস্থা। আমি নিরুত্তর। সোফায় উপবিষ্ট তাঁর পা নীচে ছড়ানো, তিনি তাঁর শশ্রুকে আড়াল করে এক জয়ীর হাসি হাসলেন এবং আমার দিকে আঙুল কাঁপিয়ে বললেন:

"চুপ করে থেকে তুমি প্রসঙ্গটি এড়াতে পারো না। তুমি ভালই জান সে কথা।"

"এ কথার জবাবে আমি, যে কিনা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁর দিকে চোরা চোখে চাইলাম, ভীরু সেই চাহনির ধরন, এবং মনে মনে বললাম :

"এই লোকটাই ভগবানের মত।"

একজন মানুষের প্রতি এর চেয়ে বড় প্রশস্তি আর কী হতে পারে জানি না।

লেখকের অন্যান্য বই

সংগীত পরিক্রমা (৩য় সংস্করণ)
কাজী নজরুলের গান
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (২য় সংস্করণ)
সাহিত্য ভাবনা
আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন
সাহিত্য ও সমাজ মানস
কথা সাহিত্য
সমকালীন সাহিত্য
সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি
বাংলার সাহিত্য
বাংলার সংস্কৃতি
সাহিত্যের সমস্যা
অম্লমধুর (রম্যরচনা)
অথ বর্ণপরিচয় কথা (রম্যরচনা)
লঘুপক্ষ (লঘুনিবন্ধ)
আত্মদর্শন (সমাজ সমালোচনা)
কুলীন কলিকার পাঁচালী (ব্যঙ্গ রচনা)
গান্ধীজি
মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার (জীবনী)
Maharshi Debendranath Tagore
Sarat Chandra Chatterjee :
His Life and Literature
চলা অবিরাম (আত্মজীবনী-যন্ত্রস্থ)

সম্পাদিত গ্রন্থ

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি
অজয়গীতি সংগ্রহ